# আবিষ্কারের কাহিনী

কাজী ইমদাদুল হক

# আবিষ্কারের কাহিনী

কাজী ইমদাদুল হক

ন্যাশনাল পাবলিকেশন

প্রকাশক
এইচ.এম. ইব্রাহিম খলিল
ন্যাশনাল পাবলিকেশন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
স্বত্ব : প্রকাশক
পঞ্চম মুদ্রণ : জুন, ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৫
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪
প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান
কম্পোজ ও গ্রাফিক্স
ওয়ার্ল্ড কালার গ্রাফিক
৪০/৪১ আহাম্মদ কমপ্লেক্স (২য় তলা)
বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ
সুপার গ্রীন প্রেস
৬১ তনুগঞ্জ লেডন, ঢাকা-১১০০
দাম : ৭০ টাকা

'Abishkarer Kahani' by Kazi Imdadul Hoque, Published By H.M. Ibrahim Khalil, National Publication, 38/4 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication : January 2004. Price : 70 Tk. Only

ISBN : 984-711-044-1

উৎসর্গ

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের
যাঁদের কল্যাণে
পৃথিবী আজ অনেক এগিয়ে

# সূচি

আর্কিমিডিস / ৫
ক্রিস্টোফার কলাম্বাস / ৮
নিকোলাস কোপারনিকাস / ১১
গ্যালিলিও গ্যালিলেই / ১৪
উইলিয়াম হার্ভে / ১৭
জেমস্ ওয়াট / ২০
লুইজি গ্যালভানি / ২৩
এডওয়ার্ড জেনার / ২৫
হামফ্রি ডেভি / ২৮
জর্জ স্টিভেনসন / ৩১
লুই পাস্তুর / ৩৪
টমাস আলভা এডিসন / ৩৭
রোনাল্ড রস / ৪০
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু / ৪৩
আলেকজান্ডার ফ্লেমিং / ৪৬
স্যার আইজাক নিউটন / ৪৯
মাইকেল ফ্যারাডে / ৫৩
চার্লস ডারউইন / ৫৭
আলফ্রেড নোবেল / ৬০
আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল / ৬৪
মাদাম কুরি / ৬৭
গুলিয়েলমো মার্কনি / ৭১
আলবার্ট আইনস্টাইন / ৭৪
জন লজি বেয়ার্ড / ৭৭

# আর্কিমিডিস

গ্রিস দেশের সিরাকিউস অঞ্চলে খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে জন্ম হয়েছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের। বুদ্ধি আর জ্ঞানে তিনি ছিলেন সেকালের সেরা পণ্ডিতদের একজন। আলেকজান্দ্রিয়া মিউজিয়াম নামে তখনকার এক বড় বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন। আর্কিমিডিস সম্বন্ধে একটা মজার গল্প শোনা যায়। তিনি নাকি একদিন 'ইউরেকা, ইউরেকা' বলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ভিজে কাপড়েই রাজপথে ছুটোছুটি করেছিলেন। গ্রিক ভাষায় 'ইউরেকা' শব্দের মানে– 'আমি পেয়ে গেছি'। তা আর্কিমিডিস কী পেয়েছিলেন, এবারে সেই কথাই বলব।

সিরাকিউসের রাজা একবার এক স্বর্ণকারের কাছ থেকে অনেক দাম দিয়ে একটা সোনার মুকুট কেনেন। কিনেই তাঁর মনে হল, স্বর্ণকার তাঁকে ঠকায়নি তো? ওটা খাঁটি সোনা দিয়েই কি তৈরি, না কি ওতে ভেজাল মেশান আছে?

যেমনি ভাবা অমনি কাজ। দেশের সেরা পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসকে অনুরোধ করলেন এই সমস্যার সমাধান করতে। মুকুটটি না ভেঙে বলতে হবে ওতে ভেজাল আছে কিনা।

অনেক ভেবেও আর্কিমিডিস কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না। দিনের পর দিন যায়, আর্কিমিডিসও ভাবছেন কীভাবে রাজার প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। একদিন আর্কিমিডিস একটা বড় পানির টবে নামলেন গোসলের জন্যে। অমনি খানিকটা পানি টব থেকে উপচে পড়ল। পানিতে নেমে আর্কিমিডিসের মনে হল তাঁর শরীরের ওজন যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে! কেন এমন হল? আমরা যে ঘটনাকে খুব সাধারণ বলে মনে করি তা থেকেই আর্কিমিডিস এক মস্ত বড় আবিষ্কার করে ফেললেন।

তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো বস্তুকে পানিতে ডোবালে বস্তুটা কিছু পরিমাণ পানি সরিয়ে দেয়। যে পরিমাণ পানি বস্তুটি সরায়, সেইটুকু পানির যত ওজন, বস্তুটির ওজন ঠিক ততটা কমে যায়। তাঁর মাথার মধ্যে এটা খেলে গিয়েছিল বলেই তিনি 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে তিনি রাজার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।

আর্কিমিডিস এরপর মুকুটটি এবং একই ওজনের খাঁটি সোনা পানিতে ডুবিয়ে দেখলেন। মুকুটটি খাঁটি সোনার তৈরি নয়। স্বর্ণকারকে ডাকা হল। সে তার দোষ স্বীকার করল।

এটাই আর্কিমিডিসের সবচাইতে বড় আবিষ্কার। তবে এ ছাড়াও কতকগুলো যন্ত্রও তিনি তৈরি করেছিলেন। তিনি খুব শক্তিশালী এক রকম আতশ কাচ তৈরি করেছিলেন যা সূর্যরশ্মিতে ধরে অনেক

দূরের জিনিসেও আগুন ধরিয়ে দেয়া যেত। এই আতশ কাচ দিয়েই সিরাকিউসে। রাজার অনুরোধে একবার তিনি রোমানদের যুদ্ধজাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। রোমানরা সিরাকিউস আক্রমণ করতে এসেছিল। সেই আক্রমণ এভাবেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

তিনি গণিত আর জ্যামিতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। পড়াশুনো করার সময় কোনো দিকেই তাঁর খেয়াল থাকত না। একবার জ্যামিতির একটা জটিল প্রশ্ন নিয়ে একমনে ভাবছিলেন তিনি। দেশে তখন রোমান আক্রমণ চলছে। রোমান সৈন্যরা তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করে। তিনি তখন জ্যামিতিতে এতই ডুবে রয়েছেন যে, কোনো জবাবই দিলেন না। সৈনিকরা তাঁকে হত্যা করে চলে গেল। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব ২১২ অব্দে সেকালের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের মৃত্যু হল।

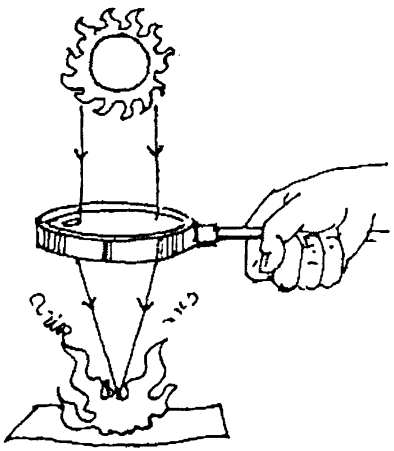

# ক্রিস্টোফার কলাম্বাস

কলাম্বাস একজন বিখ্যাত পর্যটক ও সমুদ্র অভিযাত্রী। সমুদ্রে বারবার অভিযানে তিনি এমন অনেক দেশ আবিষ্কার করেছিলেন যেগুলোর কথা সভ্য মানুষ জানতই না। কলাম্বাসের জন্ম ইতালির জেনোয়া শহরে ১৪৫১ সালে। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কলোম্বো। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই স্পেন আর পর্তুগালে কাটিয়েছেন বলে তাঁর নামটাও বদলে গিয়ে ওইসব দেশের নামের মতো হয়ে গিয়েছিল। তিনি পড়াশুনো করেছিলেন ইতালির প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। জ্যোতির্বিদ্যা আর জ্যামিতি তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আরও একটা নেশা ছিল–তা হল সমুদ্রে অভিযান। পৃথিবীর নানা দেশ দেখা আর জানার একটা দুরন্ত ইচ্ছে তাঁর মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল। বিশেষ করে ভারত, চীন আর জাপানে যাওয়া ছিল তাঁর একটা স্বপ্ন।

কলাম্বাসের বয়স যখন পঁচিশ বছর তখন একবার একটা ফরাসি জাহাজে চড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ সেই জাহাজে আগুন ধরে যায়। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কলাম্বাস সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভাসতে ভাসতে তিনি গিয়ে ওঠেন পর্তুগালের সমুদ্রতীরে। সেই থেকে বেশ কিছুদিন পর্তুগালেই থেকে যান তিনি। বিয়েও করেন একটি পর্তুগিজ মেয়েকে। এসময় জাহাজে করে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ইচ্ছেটা আরও জোরালো হল তাঁর। কিন্তু তার জন্যে দরকার জাহাজ আর টাকা—যার কোনোটাই কলাম্বাসের ছিল না।

পর্তুগালের রাজাকে তিনি তাঁর ইচ্ছের কথা বললেন। কিন্তু রাজা সে কথায় তেমন আগ্রহ দেখালেন না। এবার কলাম্বাস গেলেন স্পেনের রাণী ইসাবেলার কাছে। রাণী ইসাবেলাও চেয়েছিলেন নতুন নতুন দেশে স্পেনের বাণিজ্য আর আধিপত্য গড়ে উঠুক। তাই তিনি কলাম্বাসকে সাহায্য করতে রাজি হয়ে গেলেন।

১৪৯২ সালের ৩ আগস্ট তিনটি জাহাজ নিয়ে কলাম্বাস সমুদ্রে পাড়ি দিলেন, সঙ্গে মোট ৮৮ জন নাবিক। যে জাহাজে তিনি নিজে ছিলেন, তার নাম 'সান্তা মারিয়া'—এটাই তাঁর প্রথম অভিযান। এই অভিযানে তাঁকে অনেক বাধাবিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। নাবিকরা যখন-তখন গণ্ডগোল করত। একটা জাহাজের পাল ভাঙল একবার, অন্য একটা জাহাজের হালও ভাঙল দু'বার। এভাবে এগোতে এগোতে শেষে কলাম্বাস পৌঁছলেন ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। সেখান থেকে ১২ অক্টোবর গেলেন নতুন এক দ্বীপে। তার নাম দিলেন সান সালভাদর। এরপর একে একে গেলেন কিউবা ও হাইতি দ্বীপে। এসময়ে তাঁর জাহাজ 'সান্তা মারিয়া' খারাপ হয়ে গেলে ওটিকে বাদ দিয়ে অন্য দুটি জাহাজ নিয়ে তিনি স্পেনে ফিরে এলেন। শেষ হল তাঁর প্রথম অভিযান। স্পেনের রাজসভায় তাঁকে জাঁকজমক অভ্যর্থনা দেয়া হল।

১৪৯৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর কলাম্বাস আবার বেরোলেন সমুদ্রযাত্রায়। এবারে সঙ্গে নিলেন সতেরোটি জাহাজ আর

দেড়হাজার নাবিককে। এবারে আবিষ্কার করলেন ডমিনিকা আর জামাইকা দ্বীপ। ১৪৯৬ সালে কলাম্বাস ফিরে এলেন স্পেনে।

কলাম্বাসের তৃতীয় অভিযান শুরু হয় ১৪৯৮ সালে। এবার উপস্থিত হন দক্ষিণ আমেরিকায়। এবারেও নানা বিপত্তি আর রোগভোগের জন্য তাড়াতাড়ি স্পেনে ফিরে আসেন কলাম্বাস।

কলাম্বাসের শেষ অভিযান শুরু হয় ১৫০২ সালে। এবার তিনি যান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে, যাকে বলা হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ সময় তিনি মেক্সিকো উপসাগরও আবিষ্কার করেন। কলাম্বাসের ধারণা হয়েছিল তিনি ভারতেই এসেছেন। আসলে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন একটা নতুন মহাদেশ আমেরিকা—যার হদিশ লোকে আগে জানত না।

এই আমেরিকা নামটা দেয়া হয়েছিল অন্য এক অভিযাত্রীর নামে। তাঁর নাম আমেরিগো ভেসপুচি। আমেরিগো ওখানে গিয়েছিলেন কলাম্বাসের পরে। কিন্তু কলাম্বাস নিজেই তো জানতেন না তাঁর আবিষ্কারের কথা!

তাঁর শেষ অভিযান থেকে অসুস্থ অবস্থায় স্পেনে ফিরে এসেছিলেন কলাম্বাস। পরে ১৫০৬ সালে পৃথিবীর এই বিখ্যাত অভিযাত্রী ও আবিষ্কারকের মৃত্যু হয়।

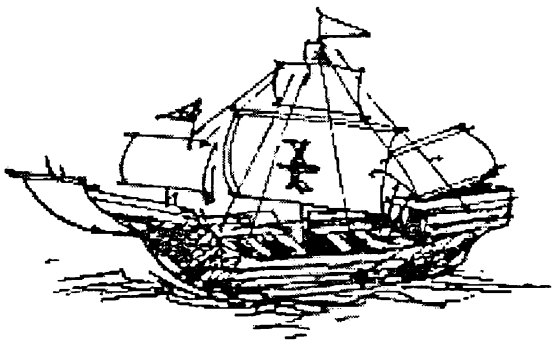

# নিকোলাস কোপারনিকাস

আমরা সবাই সৌরজগতের কথা জানি। আমরা জানি যে সূর্য আর গ্রহদের নিয়ে যেন একটা পরিবারের মতো রয়েছে সৌরজগৎ। আর সেই সৌরজগতের কেন্দ্রে রয়েছে সূর্য। পৃথিবী আর অন্য গ্রহগুলো তাকে ঘিরেই ঘুরছে। এই কথাটা এখন সবার জানা হলেও পাঁচশো-ছয়শো বছর আগে মানুষের অন্যরকম ধারণা ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই কিছু পণ্ডিত মানুষকে বুঝিয়েছিলেন যে, পৃথিবীই রয়েছে কেন্দ্রে, আর সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। ইচ্ছে করেই যে তাঁরা ভুল বুঝিয়েছেন তা নয়, তাঁদের এরকমই ধারণা ছিল।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে নিকোলাস কোপারনিকাস নামে এক বিজ্ঞানী এই ভুল ধারণা দূর করেন। তাঁর কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। আর গোড়ার দিকে লোকে তাঁর কথা মেনেও নেয়নি। তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে লোকে বুঝেছিল যে তিনি ঠিক কথাই বলে গেছেন।

জার্মানির থর্ন শহরে ১৪৭৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জন্ম হয় কোপারনিকাসের। থর্ন তখন পোল্যান্ডের অধীনে। জন্মের দশ বছর পরে বাবার মৃত্যু হওয়ায় তিনি মানুষ হন মামা লুকাসের কাছে। লুকাস তখন ওদেশের একজন যাজক।

সতেরো বছর বয়সে কোপারনিকাস ক্রাকাউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন গির্জায় কাজ নেবেন। কিন্তু পরে মনে হল, না লেখাপড়াই করতে হবে। তাঁর ভালো লাগত আইন আর জ্যোতির্বিদ্যা। তিনি চলে গেলেন ইতালিতে। সেখানে বলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় আইন পড়া শেষ করে কোপারনিকাস গেলেন পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন আর চিকিৎসাশাস্ত্র পড়তে। ১৫০৫ সালে বত্রিশ বছর বয়সে ইতালি ছেড়ে দেশে ফিরে এলেন কোপারনিকাস।

এর কয়েক বছর পরই মামা লুকাসের মৃত্যু হয়। এবার তিনি গির্জার যাজক হন। সেখানে কাজের চাপ ছিল খুব। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিত চর্চা করতেন। এভাবে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করলেন তাতে তিনি বুঝলেন যে, শুধু প্রাচীনকালের পণ্ডিতরাই ভুল করেননি, পরের যুগের পণ্ডিতরাও সূর্য আর পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক ভুল কথা বলেছেন।

সেকালের ধর্মভীরু মানুষ ভাবত যে, এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আর যা আল্লাহর সৃষ্টি তা নিশ্চয় সূর্যের চারদিকে ঘুরতে পারে না।

তাকে কেন্দ্র করেই সূর্য ঘোরে। এ কথাও তখন বলা হতো যে, পৃথিবী সম্পূর্ণ গোল, একটা বলের মতো। আরও বলা হতো পৃথিবী স্থির, পৃথিবী নড়ে না।

এর প্রত্যেকটি কথাই যে ভুল সে কথা কোপারনিকাস অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছিলেন। পৃথিবী যে পুরো গোল নয়, উত্তর-দক্ষিণে একটু চাপা সে কথা তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। দিন ও রাত্রি যে পৃথিবীর আহ্নিক বা দৈনিক গতির জন্যে হয়—তাও তিনিই প্রথম বলেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কারের কথা তিনি একটা বইয়ে লিখে ফেললেন। লিখলেন বটে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে চাননি তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল যে, তাঁর নতুন নতুন কথা লোকে বিশ্বাসই করবে না।

প্রায় ত্রিশ বছর কোপারনিকাস তাঁর লেখা বইটি আটকে রেখেছিলেন, ছাপতে দেননি। শেষে তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে বইটি ছেপে বেরোয়। তাঁর বইয়ে যা লেখা হয়েছিল তা কিন্তু লোকে সহজে মেনে নেয়নি। অনেক পরে জার্মান বিজ্ঞানী কেপলার এবং ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন যে, কোপারনিকাসই সৌরজগৎ সম্বন্ধে সত্যি কথা বলে গেছেন।

তাঁর বিখ্যাত বই 'আবর্তন' বেরোবার পরেই ১৫৪৩ সালের ২১ মে কোপারনিকাসের মৃত্যু হয়। যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে আর বিজ্ঞানের শক্তি দিয়ে তিনি মানুষের অন্ধ বিশ্বাস দূর করে অমর হয়ে আছেন। এ কারণে কোপারনিকাসকে বলা হয় জোতির্বিজ্ঞানের জনক।

# গ্যালিলিও গ্যালিলেই

গ্যালিলিও এক মস্তবড় বিজ্ঞানী। তাঁর পুরো নাম গ্যালিলিও গ্যালিলেই। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৫৬৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইতালির পিসা শহরে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছিল বিজ্ঞানের প্রতি গভীর ভালোবাসা। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে ডুবে থাকতেন তিনি। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়তে শুরু করলেও কিছুদিনের মধ্যেই ওই বিষয়টি ছেড়ে গণিত চর্চা করতে লাগলেন। তারপর মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। এসময় তিনি এমন একটা কাণ্ড করে বসলেন যা বিজ্ঞানের জগতে একটা বিরাট আলোড়ন তুলল।

প্রাচীন গ্রিসের পণ্ডিত অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে, কোনো একটা উঁচু জায়গা থেকে যদি ভারী আর হালকা দুই রকম দুটো বস্তু নিচে ফেলা যায়, তা হলে যেটার ওজন বেশি সেটাই আগে মাটিতে পড়বে। এটাই সবার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, আর সেকালের সমস্ত বইয়ে এই কথাই লেখা থাকত। সমস্ত ধর্মীয় পুস্তকেও এ কথাটাকেই সত্যি বলে প্রচার করা হতো। গ্যালিলিওর মনে হয়েছিল যে এটা মোটেই ঠিক নয়। নিজে আগে পরীক্ষা করে যখন বুঝলেন অ্যারিস্টটলের কথা ভুল তখন তিনি সমস্ত মানুষের কাছে সত্যি কথাটা বলতে চাইলেন।

এ নিয়ে একটা গল্প আছে। তিনি নাকি প্রচার করে দেন পিসার হেলানো মিনার থেকে দুটো ভিন্ন ওজনের বল নিচে ফেলে তিনি সবার সামনে প্রমাণ করে দেবেন যে ওই বল দুটো একই সময়ে মাটিতে পড়বে। নির্দিষ্ট দিনে গ্যালিলিও পিসার মিনারের সাত তলার রেলিঙের কাছে গিয়ে হাজির হলেন, সঙ্গে দুটো লোহার বল। একটার ওজন বেশি আর অন্যটার ওজন কম। সেদিন কাতারে কাতারে লোক এই দৃশ্য দেখার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিল। গ্যালিলিও একই সঙ্গে দুটো বল উপর থেকে নিচে ফেললেন। দেখা গেল বল দুটো একই সঙ্গে মাটিতে পড়ল।

গ্যালিলিওর আর একটা বড় আবিষ্কারের কথাও আমাদের জেনে রাখতে হবে। তাঁরও আগে কোপারনিকাস নামে এক বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, পৃথিবী নয়, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র। আগে মানুষ বিশ্বাস করত পৃথিবীই সব জ্যোতিষ্কের কেন্দ্র, আর সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। গ্যালিলিও প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, কোপারনিকাসই ঠিক কথা বলেছিলেন। সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ঘুরছে।

গ্যালিলিও কতকগুলো বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। তিনি খুব শক্তিশালী একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে তাই দিয়ে

জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। বৃহস্পতির যে চারটি উপগ্রহ আছে, শনির যে একটি বলয় আছে— এসব তিনিই প্রথম সবাইকে জানান।

গ্যালিলিও এমন অনেক কথাই বলেছিলেন যা সেকালের ধর্মযাজকরা মেনে নিতে পারেননি। গ্যালিলিওর আবিষ্কার তাঁদের কাছে ধর্মবিরোধী বলে মনে হয়েছিল। তাঁর লেখা বইগুলোকে পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানীরা খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন বটে, কিন্তু যাজকরা তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

সেকালে যাজকদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি ছিল খুবই বেশি। তাঁরা গ্যালিলিওকে বললেন তিনি যেন তাঁর সব আবিষ্কার মিথ্যে বলে মেনে নেন। কিন্তু যাকে তিনি সত্যি বলে জানেন তাকে মিথ্যে বলবেন কীভাবে? গ্যালিলিওকে বন্দি করা হয়। কিছুদিন পরে কারাগারেই তিনি অন্ধ হয়ে যান। শেষে খুব কষ্ট ভোগ করতে করতে ১৬৪২ সালে মারা যান তিনি।

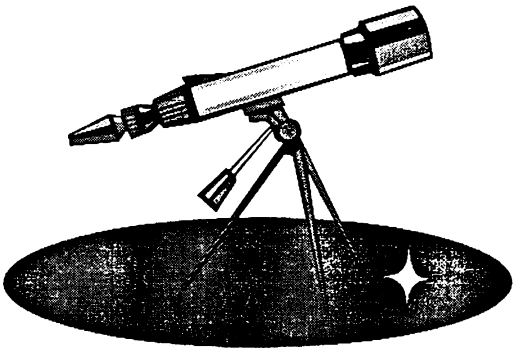

# উইলিয়াম হার্ভে

উইলিয়াম হার্ভে একজন ইংরেজ চিকিৎসাবিজ্ঞানী। চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে, মানুষের দেহ আর রোগ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদেরই বলে চিকিৎসাবিজ্ঞানী। উইলিয়াম হার্ভে যে আবিষ্কারের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তার মূল্য মোটেই কম নয়।

আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে মানুষের দেহের ভিতরে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া বা নিয়মটা তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। তখন মানুষের দেহের ভিতরটা দেখা সহজ ছিল না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রও তৈরি হয়নি। তাই একে একটা বড় আবিষ্কারই বলতে হবে।

১৫৭৮ সালে ইংল্যান্ডের কেন্ট প্রদেশের ফোকস্টোন নামে একটা ছোট শহরে হার্ভের জন্ম হয়। তাঁর বাবা টমাস হার্ভে ছিলেন ওই শহরেরই মেয়র। উইলিয়াম প্রথমে ক্যান্টারবেরিতে লেখাপড়া করেন। তারপর পনেরো বছর বয়সে তিনি পড়তে যান কেমব্রিজে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। এই সময় থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর আগ্রহ জন্মে।

১৬০২ সালে হার্ভে পাদুয়া থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার আগেই কী করবেন তা ঠিক করে ফেলেছেন। তাঁর ইচ্ছে ডাক্তারি করবেন, গবেষণা করবেন আর অধ্যাপনাও করবেন। এর প্রত্যেকটাই তিনি করেছিলেন আর পুরোপুরি সফলও হয়েছিলেন।

১৬০৭ সালে কেমব্রিজের চিকিৎসাবিদ্যার কলেজে অধ্যাপক হিসাবে চাকরি শুরু হয় হার্ভের। শুধু কি তাই? তখনকার দিনে দেশের রাজার স্বাস্থ্য দেখাশুনা করার জন্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের নিয়ে একটা দল গঠন করা হতো। হার্ভে হয়ে গেলেন সেই দলেরই একজন। এও বড় কম সম্মানের কথা নয়। এরপর বার্থোলোমিউ হাসপাতালের চিকিৎসক হন তিনি।

এসময় তিনি মানুষের শরীরের একটা বিশেষ অঙ্গ ও তার ক্রিয়া নিয়ে খুব ভাবনাচিন্তা করছিলেন। সেটি হল হৃৎপিণ্ড। আর হৃৎপিণ্ডকে নিয়ে ভাবতে ভাবতেই রক্ত চলাচলের ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে শুরু করলেন। এর আগে রক্ত চলাচল ঠিক কীভাবে হয় সে সম্পর্কে কারও সঠিক ধারণা ছিল না। এবার হার্ভির কাজ হল রক্ত চলাচল সম্পর্কে গবেষণা করা। মনে রেখো কাজটা তখন খুবই কঠিন। কারণ এক্স-রে বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র তখনও চালু হয়নি। তবে ভরসা এই যে, ততদিনে মানুষের মৃতদেহ কেটে তার ভিতরের ব্যাপারগুলো পরীক্ষা করার কাজটা একটু একটু করে চালু হয়ে গেছে। প্রাচীনকাল থেকেই সে কাজটা শুরু হলেও বহুকাল পর্যন্ত মানুষের নানা কুসংস্কারের জন্যে শবব্যবচ্ছেদে বাধা পড়ত প্রায়ই।

যাই হোক, হার্ভে কিছুটা শবব্যবচ্ছেদের উপর আর কিছুটা নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে রাত-দিন গবেষণা করতে লাগলেন।

১৬১৬ সালেই তিনি মানবদেহে রক্ত চলাচলের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লিখতে শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর আবিষ্কারের কথা ১৬২৮ সালে লেখা একটা বইয়েই সবচাইতে ভালো করে পাওয়া গেল। এ কথা সবাই মোটামুটি জানত যে মানুষের হৃৎপিণ্ডে চারটি কুঠুরি আছে, রক্ত চলাচলের জন্যে ধমনি আর শিরা নামে দুই রকমের নালিও আছে। কিন্তু ঠিক কীভাবে এসব নালি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় আর হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কই বা কী, সেটা জানা ছিল না। হার্ভে আবিষ্কার করলেন যে, শিরা দিয়ে রক্ত এসে হৃৎপিণ্ডে ঢোকে। হৃৎপিণ্ডের কাজ হল রক্তকে মানুষের সারা দেহে পাঠিয়ে দেয়া। হৃৎপিণ্ড পাম্প করে প্রায় ঠেলা মেরে রক্তকে বার করে দেয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যায় ফুসফুসে। ফুসফুসের কাজ হল রক্তকে বিশুদ্ধ করে আবার তা হৃৎপিণ্ডে পাঠানো। কিন্তু রক্ত যে পথে হৃৎপিণ্ডে এসে ঢুকেছিল সে পথে বেরোতে পারে না। বাঁদিকের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে রক্ত ডানদিকের কুঠুরিতে এসে পৌঁছয়। এভাবে ধমনি আর শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে সারা দেহে রক্ত-চলাচল হয়। এই হল হার্ভের আবিষ্কার।

দেহের মধ্যে রক্তের পরিমাণটাই যে নির্দিষ্ট তাও তিনিই প্রথম বলেছেন। তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন যে ধমনি আর শিরার কাজ আলাদা। শিরার ভিতর দিয়ে রক্ত হৃৎপিণ্ডে যায়। আর ধমনির মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের সব জায়গায় পৌঁছায়। তিনি এ কথাও প্রমাণ করে দিলেন যে, রক্ত চলাচল সর্বক্ষণ চলে। ঘুমোলেও এর বিরাম নেই। একমাত্র প্রাণী মরে গেলে রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আবার ধমনি কেটে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে থাকলেও প্রাণীর মৃত্যু হবে।

১৬৫৭ সালে প্রায় আশি বছর বয়েসে হার্ভের মৃত্যু হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং শারীরবিদ্যা চিরদিন তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

# জেমস ওয়াট

কয়েক বছর আগেও রেলগাড়ি টেনে নিয়ে যেত বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনের এমনই শক্তি যে, একটা বড় আর লম্বা রেলগাড়িকে সে সহজেই খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যেতে পারে। এই ইঞ্জিন তৈরি করে বিখ্যাত হয়ে আছেন জেমস ওয়াট নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর জন্ম হয়েছিল স্কটল্যান্ডে ১৭৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। বাবা ছিলেন সেই দেশের একজন জাহাজ ব্যবসায়ী। ছোটবেলায় কাঠ, লোহা আর যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলার ছলে জেমস নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। শোনা যায় একদিন একটা পানি ভরতি কেতলি চুলায় চাপানো ছিল। পানি ফুটে উঠতেই

কেতলির ঢাকনিটা বারবার আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। এ থেকে ওয়াট বুঝতে পারলেন যে, বাষ্পের একটা মস্ত শক্তি আছে। আর সেই শক্তিকে বড় বড় যন্ত্র বা গাড়ি চালানোর কাজে মানুষ ব্যবহারও করতে পারে। এই থেকেই নাকি ইঞ্জিন তৈরির কথাটা তাঁর মনে আসে। অবশ্য এই গল্পটা সত্যি কিনা তা বলা যায় না। কারণ, মোটরগাড়ি আবিষ্কারক হেনরি ফোর্ডের বেলায়ও একই রকম গল্প বলা হয়। সে যাই হোক, এটা ঠিক যে, ছেলেবেলায় জেমস ওয়াট নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন।

ছেলেবেলায় জেমসের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। প্রায়ই একটা ভয়ানক মাথাব্যথায় কষ্ট পেতেন আর স্কুলও কামাই হতো খুব। তাই বেশির ভাগ পড়াশুনোটা বাড়িতেই হতো। খুব পড়তে ভালোবাসতেন জেমস ওয়াট। অল্প বয়সেই অনেক বড় বড় বই পড়ে ফেলেছিলেন। তবে বাবার ব্যবসায় একবার অনেক লোকসান হয়ে যাওয়ায় তাঁকেও রোজগারের কথা ভাবতে হল। লন্ডন শহরে এসে কারিগরি কাজ শিখতে শুরু করলেন জেমস। পরে গ্লাসগো শহরে এসে একটা কারিগরির দোকানও খুলে ফেললেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর।

এইসময় তাঁর সঙ্গে রবিনসন নামে গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের পরিচয় হয়। তাঁরা দু'জনে ক্রমে খুব বন্ধু হয়ে গেলেন। দুই বন্ধুতে প্রায়ই আলোচনা করেন বাষ্প নিয়ে আর কীভাবে বাষ্পশক্তিকে বেশি করে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে।

১৭৬৪ সালে গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে জেমস ওয়াটের নজরে এলো বাষ্পীয় ইঞ্জিনের একটা মডেল। মডেলটা তৈরি করেছিলেন নিউকোমেন নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার। এই মডেলটা দেখার পর থেকে ওটাই হয়ে দাঁড়াল জেমস ওয়াটের ধ্যানজ্ঞান। দিন-রাত তিনি ভাবতে লাগলেন, কীভাবে ওই মডেলের চাইতেও ভালো একটা ইঞ্জিন বানানো যায়।

নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াট একটা ইঞ্জিন সত্যি সত্যিই তৈরি করে ফেললেন। তবে ওটার কিছু ত্রুটি ছিল। সেসব ত্রুটি দূর করে আরও ভালো ইঞ্জিন তৈরির চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। শেষে ১৭৬৮ সালে তৈরি করলেন অনেক ভালো আর শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন যাকে মানুষ ইচ্ছে করলে অনেকভাবে কাজে লাগাতে পারে।

জেমস ওয়াট পরে তাঁর ইঞ্জিনের সঙ্গে অনেকরকম যন্ত্রপাতি জুড়ে দেন। হাওয়া ঢোকাবার আর বার করে দেবার যন্ত্র, সিলিন্ডাশ, বাষ্পকে তরল করার যন্ত্র—এসবই ছিল তাঁর ইঞ্জিনে। ভেবে দেখো, আজ থেকে কত বছর আগে তিনি ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। এই ইঞ্জিন তৈরি করতে তাঁকে অনেক টাকা ধার করতে হয়েছিল। এই ইঞ্জিনকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করেই পরে জেমস স্টিভেনসন তৈরি করেছিলেন রেলগাড়ির ইঞ্জিন।

জেমস ওয়াট শুধু ইঞ্জিনই তৈরি করেননি, আরও নানা রকম যন্ত্রপাতিও তিনি তৈরি করেছিলেন। তবে ইঞ্জিনের জন্যেই তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৮১৯ সালের ২৫ আগস্ট জেমস ওয়াটের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩।

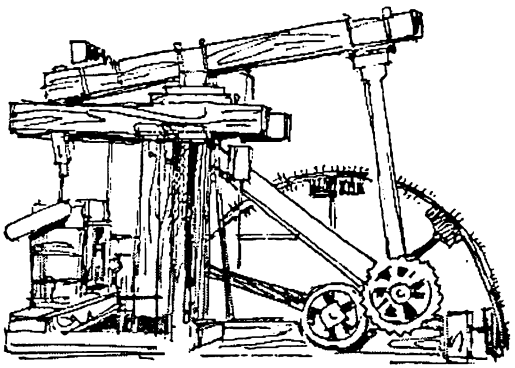

# লুইজি গ্যালভানি

প্রায় দুশো বছর আগে ইতালিতে এক শারীরবিদ্যার অধ্যাপককে লোকে একসময় ব্যাং-নাচানো অধ্যাপক বলে ঠাট্টা করতে শুরু করেছিল। সে এক মজার ব্যাপার। লুইজি গ্যালভানি নামে এই অধ্যাপক আসলে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছিলেন তখন। তিনি শারীরবিদ্যার অধ্যাপক। শুধু মানুষের নয়, অন্য প্রাণীর দেহের মাংসপেশি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করার নেশায় তিনি মেতে উঠেছিলেন। একদিন একটা মরা ব্যাঙের পা ছুরি দিয়ে কাটার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন গ্যালভানি। ঠিক সেইসময় তাঁর এক সহকারী একটা তামার তারের মতো যন্ত্র দিয়ে ব্যাংটাকে স্পর্শ করতেই ব্যাংটা যেন লাফিয়ে উঠল। ওই তামার তারটা ছিল বৈদ্যুতিক তার। চমকে উঠলেন গ্যালভানি। এবার তিনিও ওই ধাতুর তার দিয়ে ছুঁলেন ব্যাঙটিকে। আবার লাফিয়ে উঠল মরা ব্যাং। গ্যালভানি অনেকবার এরকম ব্যাং লাফানো দেখলেন। কিন্তু কারণটা তখনও ঠিক ধরতে পারলেন না। পরে এটাই তাঁর একটা

খেলা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু খেলা তো নয়, আসলে তিনি বুঝেছিলেন যে বৈদ্যুতিক তার ব্যাঙের পেশির উপর কাজ করছে। যাই হোক, লোকে তো আর এতসব বোঝেনি। তাই তারা মজা করে বলত ব্যাং-নাচানো অধ্যাপক।

ইতালির বলোনিয়া প্রদেশে ১৭৩৭ সালে জন্ম হয় লুইজি গ্যালভানির। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিল চার্চের যাজক হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলেন শারীরবিজ্ঞানী। ১৭৫৯ সালে বলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হলেন। আর ওখানেই ১৭৬৬ সালে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক হলেন। মানুষের মাংসপেশির উপর বিদ্যুতের ক্রিয়া কেমন, মাংসপেশির সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্কই বা কী– এই ছিল তাঁর সারা জীবনের গবেষণা।

ব্যাঙের মাংসপেশিতে বিদ্যুতের ক্রিয়া বোঝার যখন চেষ্টা করছিলেন তিনি, তখন আরও একটা কথা একদিন তাঁর মনে হল– আকাশের বিদ্যুৎও কি ব্যাংটাকে নাচাবে?

এক ঝড়বৃষ্টির রাতে তিনি একটা মরা ব্যাংকে একটা পিতলের আংটা দিয়ে একটা লোহার রেলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলেন। প্রতিবার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যাংও নেচে উঠল। গ্যালভানির পরীক্ষা অনেকটাই সফল হল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ব্যাঙের পেশির ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এভাবেই প্রাণীদেহের পেশি ও নার্ভের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক আবিষ্কার করে ফেললেন গ্যালভানি।

১৭৯১ সালে গ্যালভানি তাঁর এই গবেষণার কথা লিখে প্রকাশ করলেন। পরে অন্য বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে আরও নানা পরীক্ষা করেন। বিশেষ করে একজনের নাম মনে রাখা খুব দরকার। তিনি গ্যালভানিরই দেশের এক বিজ্ঞানী, নাম ভোলটা। এভাবে, মূলত একজন শারীরবিজ্ঞানী হয়েও গ্যালভানি গবেষণা করেছিলেন বিদ্যুৎ নিয়ে। প্রাণীর পেশিতে বিদ্যুতের ক্রিয়া কেমন তা নিয়ে তাঁর আবিষ্কার অন্য বিজ্ঞানীদের পথ দেখিয়েছে।

গ্যালভানি মাত্র একষট্টি বছর বেঁচেছিলেন। ১৭৯৮ সালে তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখনও লোকে তাঁর বিরাট কৃতিত্বের কথা সবটা বোঝেনি। বুঝেছে অনেক পরে। আর সেই জন্যেই বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপার একটা যন্ত্রের নামই দেয়া হয় তাঁর নামে–গ্যালভানোমিটার।

# এডওয়ার্ড জেনার

আজ থেকে দুশো বছর আগে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর হাজারে হাজারে মানুষ মারা যেত বসন্ত রোগে। বসন্ত রোগ নানা রকমের হয়। তার মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হল গুটিবসন্ত। এই রোগ হলে খুব কম লোকই বাঁচত। আর যারা বাঁচত তাদের কারও চোখ নষ্ট হয়ে যেত, কারও বা সারা শরীরে বিশ্রী ক্ষতচিহ্ন থেকে যেত। এখন কিন্তু বড় একটা গুটিবসন্ত হয় না। দুশো বছর আগে এডওয়ার্ড জেনার নামে একজন ইংরেজি চিকিৎসক বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন। সেই টিকাই বসন্তের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে। এমন একটা রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছেন

বটে, কিন্তু ডাক্তার জেনারের কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। অনেক দিনের চেষ্টা আর পরিশ্রমে, অনেক লোকের নিন্দা উপেক্ষা করে তবে জেনার পেরেছেন বসন্তের টিকা আবিষ্কার করতে।

জেনারের জন্ম হয়েছিল ইংল্যান্ডের বার্কলি নামের একটি জায়গায় ১৭৪৯ সালের ১৭ মে। তাঁর বাবা ছিলেন ওখানকার গ্রামের ধর্মযাজক। গ্রামের স্কুলেই জেনারের লেখাপড়া চলতে লাগল। ছোটবেলায় পশুপাখি আর গাছপালা তাঁকে খুবই আকর্ষণ করত। তবে একটু বড় হয়ে ডাক্তার হবার ইচ্ছেটাই হয়েছিল সবচেয়ে প্রবল।

তখনকার দিনে কেউ ডাক্তার হতে চাইলে আ গ একজন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার প্রাথমিক ব্যাপারগুলো শিখে নিতে হতো। তবেই তাকে কোনো মেডিক্যাল স্কুলে বা কলেজে ভরতি করা হতো। জেনার ব্রিস্টল শহরের কাছে একটা ছোট জায়গায় লাডলো নামে একজন চিকিৎসকের কাছে কিছুদিন ডাক্তারি শেখেন। তারপরে পাঁচ-ছয় বছর লন্ডনের ডা. জন হান্টার নামে এক শল্যচিকিৎসকের কাছে শিক্ষালাভ করেন। এরপর জেনার পুরোদস্তুর ডাক্তার হন এবং লন্ডনের সেন্ট জর্জ হাসপাতালে চিকিৎসকের কাজ পান। আর ঠিক এসময় এমন একটা ঘটনা ঘটে, যা তাঁর জীবনটাকেই অন্য দিকে নিয়ে গেল।

এসময় জেনারের পরিচিত এক গোয়ালিনি তাঁকে দুধ দিতে আসত। এই মেয়েটির হাতে ছিল গো-বসন্তের ঘা। গরু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে এই রোগ হতো। তবে গো-বসন্ত আসল বসন্তের মতো সাংঘাতিক রোগ নয়। সেই সময়ে একবার ওই মেয়েটির গ্রামে বসন্তের মড়ক দেখা দিলে জেনার তাকে সাবধান করে দেন। মেয়েটি বলল যে তার কোনো ভয় নেই। কারণ যার গো-বসন্ত একবার হয়েছে তার আর কখনো বসন্ত হবে না।

প্রথমে জেনার এই কথাটা প্রায় হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে তাঁর মনে হল ব্যাপারটা সত্যি কি না তা যাচাই করে দেখলেই তো হয়। তাঁর শিক্ষক ডা. হান্টারও তাঁকে এ নিয়ে গবেষণা করতে বললেন।

১৭৯৬ সালে জেনারের একটা সুযোগ জুটে গেল। তিনি তার বাড়ির মালির ফিপ্‌স নামে একটি আট বছর বয়সের ছেলের শরীরে গো-বসন্তের বীজ ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর যখন তার গো-বসন্ত হল তখন তিনি তার শরীরে আসল বা গুটি বসন্তের বীজ ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দিলেন। কিছুদিন পরে ছেলেটির গো-বসন্ত সেরে গেলই, এমনকী গুটি বসন্তও হল না। জেনার তো আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেলেন। তার মানে গো-বসন্তের বীজ দিয়ে আসল বসন্তকে ঠেকানো যায়।

আরও দু'বছর জেনার এটা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তাঁর আর কোনো সন্দেহই রইল না যে, গো-বসন্তের বীজ যদি টিকার মতো কোনো লোকের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া যায়·তবে তার বসন্ত হবে না।

এবার জেনার সারা জগৎকে জানাতে চাইলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। কিন্তু তখনও অনেকেই জেনারের আবিষ্কারকে সন্দেহের চোখে দেখলেন। তবে ধীরে ধীরে লোকে মেনে নিল সব। আর জেনারের এই আবিষ্কারের ফলে গুটি বসন্তে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেল। দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষ জেনারকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধি দিয়ে সম্মান জানালেন।

একসময় যে রোগ ছিল সারা পৃথিবীতে একটা ভয়ের ব্যাপার, তার হাত থেকে মানুষকে বাঁচালেন জেনার। আজ যে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে বসন্ত প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে, সে তো তাঁরই জন্যে।

১৮২৩ সালে টিকার আবিষ্কর্তা জেনারের মৃত্যু হয় তাঁর জন্মস্থান বার্কলিতে।

# হামফ্রি ডেভি

তোমরা নিশ্চয় জানো যে, কয়লা পাওয়া যায় মাটির তলার খনি থেকে। সেই খনির শ্রমিকেরা দেয়াল থেকে কেটে কেটে কয়লা উপরে তোলে। মাটির তলায় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কাজের সুবিধের জন্যে যে আলো জ্বালা হতো তাতে অনেক সময় আগুন জ্বলে উঠত আর মারা যেত অনেক শ্রমিক। মিথেন নামে একরকম গ্যাস তাপ পেলে জ্বলে উঠত বলেই এসব দুর্ঘটনা ঘটত। শেষে একদিন এক ইংরেজ বিজ্ঞানী এমন একরকম বাতি তৈরি করলেন যাতে খনির অন্ধকারও দূর হবে, অথচ আগুনও জ্বলে উঠবে না। এই বিজ্ঞানীর নাম স্যার হামফ্রি ডেভি।

স্যার হামফ্রি ডেভির জন্ম ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল নামে এক জায়গায় ১৭৭৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর। স্কুলের লেখাপড়ার শেষে তাঁর চিকিৎসক হবার ইচ্ছে ছিল। বাবার মৃত্যুর পরে এক চিকিৎসকের কাছে ডাক্তারির কাজ শিখতে শুরু করেন ডেভি। কবিতাও ভালোবাসতেন তিনি। কিন্তু কবিতা বা চিকিৎসা কোনোটাই হল না। তিনি শুরু করলেন বিজ্ঞান চর্চা।

১৭৯৭ সালে গিলবার্ট নামে এক গবেষকের সঙ্গে আলাপ হল। গিলবার্ট তাঁকে নিয়ে যান এক চমৎকার গবেষণাগারে। এমন গবেষণাগার ডেভি কখনো দেখেননি। এখানেই ডেভি শুরু করলেন তাপ, আলো আর বিদ্যুৎ নিয়ে চর্চা। তাছাড়া রসায়ন নিয়েও তিনি গবেষণা করতেন। পরে তিনি নিজেই একটা গবেষণাগার তৈরি করে ফেললেন। এসময় রসায়ন নিয়েও তিনি অনেক লেখাপড়া করতেন। নানারকম গ্যাস নিয়ে পড়াশুনো আর পরীক্ষা করতে করতেই একদিন তৈরি করে ফেললেন খনিতে কাজ করার বাতি। তাকে বলা হয় 'নিরাপদ বাতি'।

মাটির নিচে খনিতে কাজ করার সময় শ্রমিকেরা যে বাতি জ্বালত তা থেকে তাপ বেরিয়ে বাতির বাইরের গ্যাসের সঙ্গে মিশলেই আগুন জ্বলে যেত। ডেভি এমন এক বাতি তৈরি করলেন যা আলো দেবে কিন্তু তার তাপ মিথেন গ্যাসের সঙ্গে মেশার আগেই কমে যাবে। তখন আর আগুন জ্বলে দুর্ঘটনা ঘটবে না। ডেভি এই বাতি তৈরি করেন ১৮১৫ সালে। আর এর ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের প্রাণ বেঁচে যায়।

স্যার হামফ্রি ডেভির সবচাইতে বিখ্যাত আবিষ্কার এটাই। তবে তিনি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি এমন একরকম গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন যা অল্প সময়ের জন্যে মানুষের শরীরের কোনো অংশকে অসাড় করে দেয়। আবার পুরোপুরি অজ্ঞানও করে

দিতে পারে এই গ্যাস। অপারেশন করা বা দাঁত তোলার জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করতেন চিকিৎসকরা। এই গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে নিশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নিলে হাসি পায়। তাই এর আর এক নাম লাফিং গ্যাস বা হাসানো গ্যাস।

গবেষণার জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে 'স্যার' উপাধি দেন। তিনি লন্ডনের রয়াল সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। আরও নানা সম্মান পেয়েছিলেন তিনি। তখনকার দিনের তরুণ গবেষক ছাত্র ও বিজ্ঞানীদের তিনি নানাভাবে উৎসাহ দিতেন, সাহায্য করতেন।

১৮২৯ সালের ২৯ মে সুইজাল্যান্ডের জেনিভা শহরে স্যার হামফ্রি ডেভির মৃত্যু হয়।

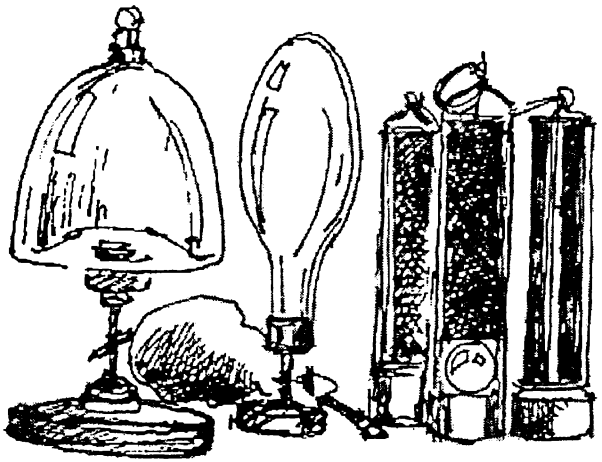

# জর্জ স্টিভেনসন

রেল ইঞ্জিন আর রেলগাড়ির আবিষ্কারের ফলে আমাদের যে কত উপকার হয়েছে সে কথা বলে শেষ করা যায় না। এখন অবশ্য ডিজেল ইঞ্জিন আর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু একসময় কয়লার ইঞ্জিনই সারা পৃথিবীতে চলত। এই কয়লার রেলইঞ্জিন তৈরি আর রেললাইনের উপর দিয়ে প্রথম রেলগাড়ি চালানোর কৃতিত্বটি স্কটিশ বিজ্ঞানী জর্জ স্টিভেনসনের। এখন তাঁর কথাই বলব।

১৭৮১ সালে জর্জ স্টিভেনসনের জন্ম হয় এক অতি দরিদ্র পরিবারে। এতই দরিদ্র ছিলেন তাঁরা যে, টাকার অভাবে

লেখাপড়াও শিখতে পারেননি। বাবা সামান্য কাজ করতেন একটা কয়লার খনিতে। তাঁর সঙ্গেই মাঝে মাঝে খনিতে যেতেন জর্জ। আর তার ফলে খনির কাজ অল্প বয়সেই বেশ খানিকটা শিখে গিয়েছিলেন। শেষে একসময় জর্জের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবার কাজটা জর্জই পেয়ে গেলেন। তাঁর তখন বয়েস দশ কি এগারো মাত্র।

খনিতে একটা ইঞ্জিন ছিল। বাষ্পচালিত সেই ইঞ্জিন দিয়ে কয়লার বালতি খনি থেকে মাটির উপরে টেনে তোলা হতো। এই ইঞ্জিনটি জর্জের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আগে থেকেই বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নিয়ে তাঁর অনেক কৌতূহল ছিল। তিনি জানতেন যে ১৭৯৬ সালে জেমস ওয়াট একটা বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরি করেছিলেন। সেই ইঞ্জিনকে নানা কাজে লাগানোও হচ্ছিল। তবে জেমস ওয়াটের ইঞ্জিন চলতে পারত না, আর তার শক্তিও কম ছিল।

জর্জ স্টিভেনসন ভাবতেন কীভাবে এই ইঞ্জিনকে আরও শক্তিশালী করা যায়, আর তাকে এক জায়গা থেকে অন্য আর এক জায়গায় চালিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু ইঞ্জিন নিয়ে কৌতূহল থাকলেও জর্জ যে তখন খনির শ্রমিক। তাঁর বয়েসও খুব কম, আর লেখাপড়াও তিনি জানতেন না। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন তিনি। এক নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত গিয়ে পড়াশুনো শিখতে লাগলেন। কঠোর পরিশ্রম করতে হতো তাঁকে। সারাদিন খনির কাজ, আর রাতে লেখাপড়া। এভাবে কয়েক বছর কেটে যাবার পরে শুধু সাধারণ লেখাপড়াই নয়, বিজ্ঞানের অনেক কিছুই জর্জ স্টিভেনসন শিখে ফেললেন, শিখে ফেললেন জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের খুঁটিনাটি।

যখন তাঁর বয়েস তেত্রিশ বছর তখন, ১৮১৪ সালে জর্জ স্টিভেনসন তৈরি করলেন একটা ছোটমতো ইঞ্জিনগাড়ি–যা ঘণ্টায় ৭ কিলোমিটার বেগে আর একটা ওয়াগনকে টেনে টেনে নিয়ে

যেতে পারে। এরপর যে কয়লাখনিতে তিনি কাজ করতেন সেখানে রেললাইন পেতে তার উপর দিয়ে ওই ওয়াগন সমেত ইঞ্জিনগাড়ি চালিয়ে দেখালেন সবাইকে। অবাক হয়ে লোকে শুধু দেখলই না, এইরকম ইঞ্জিনগাড়ি আরও তৈরি করে দেয়ার জন্যে চারদিক থেকে অনুরোধ আসতে লাগল।

এরপর ইংল্যান্ডের রাজা স্বয়ং তাঁকে বললেন স্টকটন আর ডার্লিংটনের মধ্যে ৫৮ কিলোমিটার পথে রেললাইন বসাতে হবে। কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্টিভেনসন এই কাজ সম্পূর্ণ করলেন। এবার কিন্তু একটা ছোটখাটো যাত্রীগাড়িই ওই রেললাইনের উপর দিয়ে চালালেন তিনি। গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ২০ কিলোমিটার। ১৮২৫ সালে এই ঘটনাটা ঘটে বহু লোকের চোখের সামনে।

আর তারপর পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে জর্জ স্টিভেনসনের ডাক আসতে লাগল রেলইঞ্জিন আর রেলপথ তৈরি করার জন্যে। স্থলপথে মানুষ আর মালপত্র দ্রুত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানোর কাজটা রেলগাড়ির সাহায্যে চলছে সারা পৃথিবী জুড়ে। এর জন্যে আমরা সবাই জর্জ স্টিভেনসনকে চিরদিন মনে রাখব। তিনিই এই কাজটি সম্ভব করেছেন।

১৮৪৮ সালে স্টিভেনসনের মৃত্যু হয়।

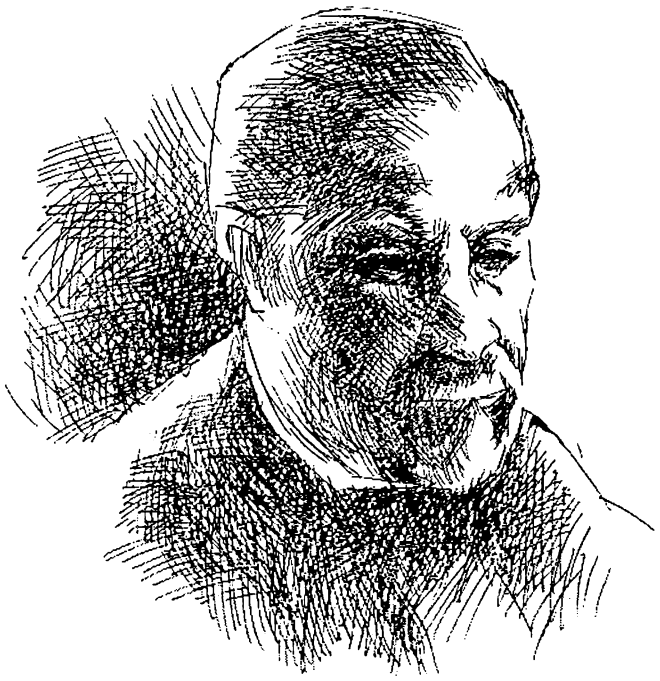

# লুই পাস্তুর

ফ্রান্সের একটি শহর, নাম লিল। সময় ১৮৫৪ সাল। এখানে তখন কতকগুলো মদের কারখানা ছিল। একসময় দেখা গেল মদ টকে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মদের ব্যবসায়ীরা গিয়ে ধরে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে, তাঁর নাম লুই পাস্তুর। পাস্তুর রসায়ন বা কেমিস্ট্রির অধ্যাপক, আর নানারকম জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে তখন খুবই বিখ্যাত। প্রায় দু'বছর ধরে গবেষণা করে পাস্তুর মদ ভালো রাখার উপায় বার করে ফেললেন। ফ্রান্সের মদ পৃথিবীবিখ্যাত। পাস্তুরের জন্যেই বেঁচে রইল ফরাসি মদ।

এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল ১৮২২ সালে ছোট্ট শহর

দোলে। তাঁর বাবা ছিলেন চর্মব্যবসায়ী। ছেলের লেখাপড়ার দিকে তাঁর খুবই নজর ছিল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পাস্তুরের শিক্ষা শুরু হয়। পরে তিনি পড়াশুনো করেন আর্তোয়ায় আর সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর প্রথম চাকরি অঙ্কে শিক্ষকতা। কিন্তু ওখানেই লেখাপড়া শেষ করতে চাননি তিনি। তাই তাঁর প্রিয় বিষয় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার চর্চা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

রাসয়নে তাঁর কৃতিত্বের জন্য পাস্তুরকে স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক করা হয়। রসায়ন আর জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে তখন তিনি এতই সুনাম করেছিলেন যে, নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক আসতে লাগল। বিশেষ করে টারটারিক অ্যাসিড নামে একরকম অ্যাসিড বা অম্ল নিয়ে তাঁর গবেষণার কথা তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। ১৮৫৪ সালে তিনি লিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক হন। এখানেই তিনি মদ সংরক্ষণের উপায় আবিষ্কার করেন। সে কথা আগেই বলেছিল।

আর শুধু কি তাই? যে কোনো জিনিসকে পচন থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায়, তারও উপায় ও কৌশল তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত কৌশলের নাম পাস্তুরীকরণ। এই পদ্ধতিতে সমস্ত রকমের খাদ্যকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে আজও। দুধ ও অন্যান্য তরল খাদ্যকে পাস্তুরীকরণের কৌশলে অনেকদিন পর্যন্ত ভালো রাখা যায়।

তোমরা সবাই জানো যে, গুটিপোকার রস থেকে রেশম বা সিল্ক পাওয়া যায়। অথচ সেই গুটিপোকার একরকম রোগ তখন ফ্রান্সে রেশম শিল্পের খুবই ক্ষতি করছিল। ১৮৬৫ সালে পাস্তুর এই রোগের হাত থেকে কীভাবে গুটিপোকাকে বাঁচানো যায় তা আবিষ্কার করেন। এসময় কলেরা রোগ নিয়েও পাস্তুর গবেষণা করেছিলেন। তবে পাস্তুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব র‍্যাবিজ বা জলাতঙ্ক রোগের টিকা আবিষ্কার। এই আবিষ্কারের জন্যে তিনি যেমন অমর হয়ে আছেন, তেমনি পৃথিবীর মানুষও এর জন্যে তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে রয়েছে।

সবাই জানত যে, পাগলা কুকুরের কামড় থেকে একরকম মারাত্মক রোগ হয়। তখনকার দিনে সেই রোগ একবার হলে মানুষ বাঁচত না। পাস্তুর ১৮৮০ সালে জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে তাঁর গবেষণা শুরু করেন। অনেকগুলো পাগলা কুকুরকে আটকে রেখে তিনি নানাভাবে তাদের উপর নজর রাখতে লাগলেন। অনেক কষ্টে পাগলা কুকুরের লালাও তিনি সংগ্রহ করলেন। পরীক্ষা করে তিনি জানতে পারলেন যে, একরকম জীবাণু কুকুরের শরীরে ঢুকে তাকে অসুস্থ করে তোলে। এই জীবাণুর নাম র‍্যাবিজ। এই রোগ হলে কুকুর খেপে যায়। তার জিভ দিয়ে লাল ঝরতে থাকে। আর সে তখন যাকে সামনে পায় তাকে কামড়াতে চায়। আর কামড়ালেই ওই রোগের জীবাণু ঢুকে যায় যাকে কামড়াল তার শরীরে। এবারে সেই মানুষটি ওই রোগে পড়ল। বড় ভয়ানক এই রোগ। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়, পানি খেতে পারে না, অথচ পিপাসায় জিভ শুকিয়ে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে মানুষ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

পাস্তুরের গবেষণা শেষ পর্যন্ত সফল হল। ১৮৮৫ সালে তিনি আবিষ্কার করেন এই রোগের টিকা। জোসেফ নামে একটি ছেলের শরীরে টিকা দিয়ে তিনি তাকে ওই ভয়ানক রোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলেন। ঘটনাটি জানাজানি হতে দেরি হল না। সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ল এই খবর। এর পরে প্যারিসে পাস্তুরের নামে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হল। তার সামনে পাস্তুর জোসেফকে টিকা দিচ্ছেন এরকম একটা মূর্তি বসানো হল। আমাদের দেশেও আছে পাস্তুরের নামে গবেষণাগার ও চিকিৎসার কেন্দ্র।

অনেক গবেষণা করে আর অনেক বই লিখে অমর হয়েছেন পাস্তুর। তিয়াত্তর বছর বয়সে ১৮৯৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

# টমাস আলভা এডিসন

গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও নিজের চেষ্টা আর বুদ্ধির জোরে অনেক বড় হয়েছেন এমন অনেকের কথাই আমরা জানি। এরকম একজন মানুষ টমাস আলভা এডিসন। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন গ্রামোফোন আবিষ্কারের জন্যে।

১৮৪৭ সালে আমেরিকায় তাঁর জন্ম। দরিদ্র পরিবারের সন্তান তিনি। তাই বেশ কষ্ট করেই লেখাপড়া শিখতে হয়েছে তাঁকে। ছেলেবেলা থেকেই বিজ্ঞানকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বিজ্ঞান

তাঁর কাছে ছিল একটা নেশার মতো জিনিস। নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। ছোট বয়েসেই ভাঙাচোরা জিনিস দিয়ে কয়েকটা যন্ত্র নিজে বানিয়েও ফেলেছিলেন। এমনি করেই একদিন ত্রিশ বছর বয়েসে তৈরি করলেন গ্রামোফোন যন্ত্র যাকে তিনি বলতেন ফোনোগ্রাফ।

আমাদের কথাবার্তা বা গান যদি যন্ত্রে ধরে রাখা যেত তাহলে বেশ হতো। বারবার তা শোনা যেত। এই ভাবনাটাই এডিসনকে পেয়ে বসল। এ নিয়ে সবসময়ই ভাবতেন তিনি। আর যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করতেন। শেষে ১৮৭৭ সালে তাঁর নিউ জার্সি-শহরের গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎই বুঝে ফেললেন কীভাবে ফোনোগ্রাফ বানানো যাবে। যেই তা বুঝে ফেললেন অমনি কাজও শুরু হয়ে গেল।

যে যন্ত্রটা তিনি তৈরি করতে চান তার জন্যে লাগবে একটা বাক্সো, কিছু তার, একটা টিনের পাত, একটা সুঁচ, একটা পিতলের খোল, আরও নানা সব জিনিস। যন্ত্রটার ভিতরের চেহারাটা কেমন হবে তার একটা ছবিও এঁকে ফেললেন। তারপর গেলেন এক মেকানিক বা কারিগরের কাছে। সে ওই ছবি দেখে তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটা যন্ত্র তৈরি করে দিল।

এডিসনের তখন সে কী উত্তেজনা। আশা-নিরাশায় তাঁর বুক কাঁপছে তখন। যন্ত্রটা যদি ঠিক ঠিক কাজ করে তবে তা একটা দারুণ ব্যাপার হবে। চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে। আর যদি যন্ত্রটা কাজ না করে, তবে তাঁর এতদিনের চেষ্টা মাটি হয়ে যাবে। তাঁর যন্ত্রে যে ধাতুর পাতলা পাতটা ছিল তার কাছে মুখ এনে তিনি প্রথমেই যে কথাগুলো বললেন তা হল তাঁর ছেলেবেলায় শোনা একটা ছড়ার লাইন–'ম্যারি হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব'। যন্ত্রটা থামিয়ে দিয়ে কী হল তা শোনার জন্যে যখন দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছেন

তখন তিনি শুনলেন তাঁর নিজের গলায় ছড়ার ওই লাইনটা। অবশ্য আওয়াজটা একটু অস্পষ্ট। তা হোক, তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। এডিসন এরপর ওই যন্ত্রটাকে আরও উন্নত করার জন্যে অনেক খেটেছেন। পরে ওই যন্ত্রের সঙ্গে তিনি একটা চোঙাও লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

এডিসনের আর এক আবিষ্কার হল বিজলি বাতি। বিজলি বাতি অবশ্য আগেই সোয়ান নামে এক ইংরেজি বিজ্ঞানী তৈরি করেছিলেন। ১৮৭৮ সালে এডিসন তৈরি করলেন অনেক উন্নত আর ভালো বিজলি বাতি। তিনি সিনেমার প্রজেক্টর, গাড়ির ব্যাটারি, মোম মাখানো কাগজও আবিষ্কার করেছিলেন।

আর শুধু কি এই? কত যে যন্ত্রপাতি এডিসন তৈরি করেছিলেন তার হিসেব রাখাই শক্ত। শোনা যায় ছোট-বড় মিলিয়ে তিনি নাকি এক হাজারেরও বেশি যন্ত্র বানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই বিরাট আবিষ্কারের জন্যে মানুষ চিরকাল তাঁকে মনে রাখবে।

১৯৩১ সালে চুরাশি বছর বয়েসে টমাস আলভা এডিসনের মৃত্যু হয়।

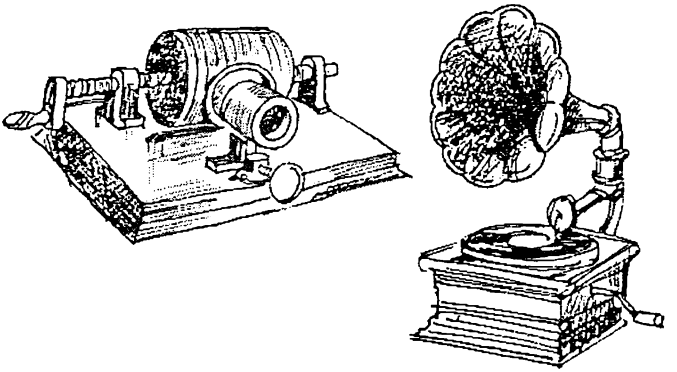

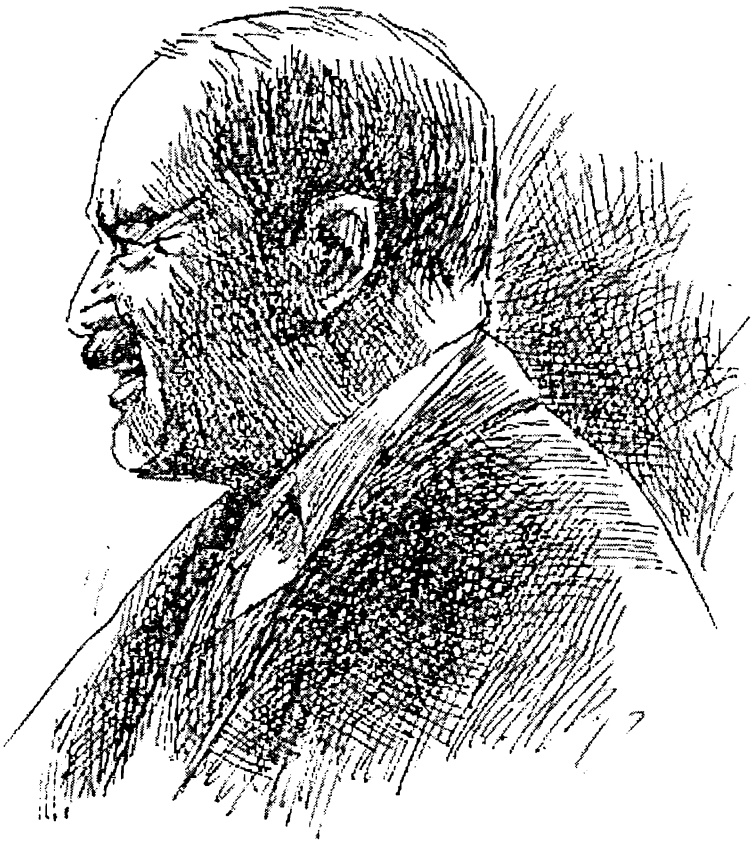

# রোনাল্ড রস

ম্যালেরিয়া রোগের নাম তোমরা সবাই জানো। একসময় এই রোগে নানা দেশের লাখ লাখ লোক মারা গেছে। পরে এই রোগ আস্তে আস্তে কমে যায়। অনেক দেশে এখন ম্যালেরিয়া একেবারেই নেই। তবে আমাদের দেশে অবশ্য আবার ম্যালেরিয়া রোগ ঘুরে এসেছে। এই ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন বিজ্ঞানী রোনাল্ড রস।

একসময় মানুষের ধারণা ছিল যে, দূষিত বাতাস থেকেই ম্যালেরিয়া রোগ হয়। ম্যালেরিয়া কথাটার মানে 'দূষিত বাতাস'। পরে জানা গেছে, এ রোগ মোটেই দূষিত বাতাস থেকে হয় না। কীভাবে এই রোগ হয় তা ঠিক ঠিক জানার আগেই অবশ্য লোকে জেনে গিয়েছিল যে সিনকোনা নামে একরকম গাছের ছালের রস রোগীকে খাওয়ালে এই রোগ সেরে যায়। পরে এই সিনকোনা গাছ থেকেই কুইনিন নামে ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরি হয়েছে।

কীভাবে এই রোগ মানুষের শরীরে ঢোকে তা নিয়ে অনেকদিন ধরে অনেক বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন, কিন্তু আসল কথাটা জানতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত সেই কথাটা জানতে পারলেন রোনাল্ড রস।

স্যার রোনাল্ড রস একজন ইংরেজ চিকিৎসক। তাঁর জন্ম হয়েছিল আমাদেরই দেশের আলমোড়া নামে এক পাহাড়ি শহরে ১৮৫৭ সালের ১৩ মে। তিনি ডাক্তারি শিখেছিলেন লন্ডনের সেন্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে। চব্বিশ বছর বয়েসে ডাক্তারির চাকরি নিয়ে তিনি ভারতে চলে আসেন।

যখন তিনি কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসকের চাকরি করছিলেন তখন থেকেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি এমন একটা দেশে চাকরি করছিলেন যেখানে হাজারে হাজারে লোক ম্যালেরিয়া রোগের কবলে পড়ে। এতে তাঁর কাজের খুবই সুবিধে হল। রস জানতে পারলেন যে, অ্যানোফিলিস নামে একজাতীয় স্ত্রী-মশার কাপড় থেকেই ম্যালেরিয়া হয়। কীভাবে সেই রোগের জীবাণু মানুষের শরীরে ঢোকে, তাও রস কিছুদিনের মধ্যেই জেনে ফেললেন। তখন তিনি কলকাতা থেকে বদলি হয়ে গেছেন সেকেন্দ্রাবাদে। সেখান থেকে যান আফ্রিকায়।

রসের কাজই হয়েছিল মশাদের ধরে তাদের দেহের নানা অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ফেলে পরীক্ষা করা। এভাবে পরীক্ষা করতে করতে রস জানতে পারলেন যে, অ্যানোফিলিস স্ত্রী মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাসা বাঁধে। সেই মশা যদি কোনো লোককে কামড়ায় তাহলে তার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ঢুকে যাবে। আবার ম্যালেরিয়ার রোগীকে অ্যানোফিলিস মশা কামড়াবার পরে সেই মশা অন্য কোনো সুস্থ লোককে কামড়ালে ওই সুস্থ লোকটিরও ম্যালেরিয়া হবে। কেননা তার শরীরেও তখন জীবাণু ঢুকে যাবে।

এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য দেশে দেশে রোনাল্ড রসের নাম ছড়িয়ে পড়ল। তিনি এরপর লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ইংল্যান্ডের সরকার রসকে 'স্যার' উপাধি দেয়।

১৯০২ সালে রস নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৩২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পঁচাত্তর বছর বয়েসে রসের মৃত্যু হয়।

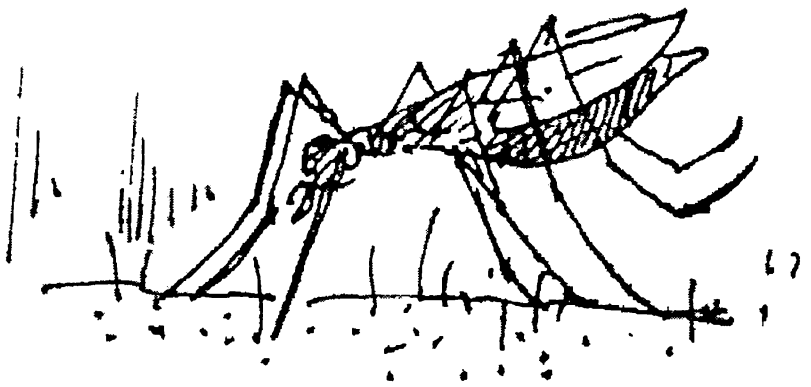

# স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

১৯০১ সালের ১০ মে লন্ডনের রয়াল সোসাইটির হলঘর লোকে লোকারণ্য। লোকে সেখানে ভিড় করেছে এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর কথা শোনার জন্য আর তাঁর তৈরি এক আশ্চর্য যন্ত্র দেখার জন্য। সেই বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখাবেন যে, প্রাণীর মতো উদ্ভিদেরও চেতনা আছে, বোধ আছে। সেও আমাদের মতো সাড়া দেয়। সত্যিই সেদিন সেই ভারতীয় বিজ্ঞানী তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন আর তার জন্য সারা পৃথিবী তাঁকে এক মস্ত বড় বিজ্ঞানী বলে মেনে নিয়েছে।

জানো কি কে এই বিজ্ঞানী? তিনি হলেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি ভারতের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ছিলেন। বলতে গেলে জগদীশচন্দ্রই আমাদের দেশে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর। তাঁর বাবা ভগবানচন্দ্র ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাই জগদীশচন্দ্রের লেখাপড়া ফরিদপুরেই একটা ছোট পাঠশালায় শুরু হয়েছিল। বাবা ভগবানচন্দ্র ইংরেজ আমলের ম্যাজিস্ট্রেট হলে কী হবে, তিনি ছিলেন একেবারে খাঁটি বাঙালি। বিলেতি চালচলন তাঁর মোটেই পছন্দ ছিল না। ছেলে জগদীশচন্দ্রও বাবার এই স্বভাবটা পেয়েছিলেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হলে জগদীশচন্দ্র কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুলে এবং তারপরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৭৫ সালে তিনি বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮০ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে বি.এ. পাশ করেন।

বি.এ. পাশ করার পরে জগদীশচন্দ্র বিলেতে যান ডাক্তারি পড়তে। ডাক্তারি পড়ার খুব একটা ইচ্ছে তাঁর নিজের ছিল না। বাবার ইচ্ছেতেই ডাক্তারি পড়ার জন্যে লন্ডনের এক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এসময় তাঁর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। আর ডাক্তারিতে মনও বসছিল না। তাই পরের বছর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি. ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৮৮৪ সালে বি.এসসি. পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে সামান্য বেতনে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এসময় তিনি একদিকে যেমন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপনা করতে লাগলেন, অন্যদিকে তেমনি এসময় থেকেই তিনি ডুবে রইলেন নানা গবেষণার কাজে।

জগদীশচন্দ্রের প্রথম দিকের গবেষণার বিষয় ছিল তারের সাহায্য ছাড়াই খবর বা সংকেত কীভাবে দূরে পাঠানো যায় তাই নিয়ে। দিনের পর দিন প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি এমন একটা যন্ত্র তৈরি করলেন যাতে তিনি এতদিন ধরে যা চাইছিলেন তা করা সম্ভব হল। ওই যন্ত্রের সাহায্যে কোনো তার ছাড়াই এক ঘর থেকে দূরের

আরেক ঘরে সংকেত পাঠানো সম্ভব হল। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তারই সাহায্যে জগদীশচন্দ্র এই বিরাট আবিষ্কারটি করেছিলেন। তাঁর এই গবেষণার জন্য তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব সায়েন্স উপাধি লাভ করেন।

এরপর উদ্ভিদের চেতনা অনুভূতি এসব নিয়ে গবেষণা করতে থাকে জগদীশচন্দ্র। গবেষণা যতই এগোয় ততই তাঁর এই বিশ্বাস হতে থাকে যে প্রাণীদের মতো উদ্ভিদেরও চেতনা বা বোধ আছে। নানাভাবে স্পর্শ বা আঘাত করলে উদ্ভিদও সাড়া দেয়। এই ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্য তিনি অনেকগুলো যন্ত্র তৈরি করেন। তার মধ্যে ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্রটাই আসল। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিলেন যে গাছেরও বোধ আছে, কষ্ট আছে, যন্ত্রণা আছে।

ব্রোমাইড নামে একরকম বিষ লাগিয়ে দিলে উদ্ভিদ কীভাবে প্রথমে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল আর তারপর ধীরে ধীরে মরে গেল, তা দেখিয়ে তিনি সবাইকে অবাক করে দেন। ক্রেসকোগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভিদের নড়াচড়া বা কুঁকড়ে যাওয়া অনেক বড় করে দেখায়। উদ্ভিদের এই কুঁকড়ে যাওয়া এমনিতে খালি চোখে দেখা যায় না। তবে লজ্জাবতী পাতার কুঁকড়ে যাওয়া খালি চোখে দেখা যায়।

দেশবিদেশের নানা সম্মান লাভ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। ১৯১৭ সালে তিনি বিজ্ঞান চর্চা আর গবেষণার জন্যে 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' নামে একটি সংস্থা তৈরি করেন কলকাতায়। আমাদের দেশের গৌরব যাঁরা বাড়িয়েছেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁদেরই একজন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন।

জগদীশচন্দ্র শুধু বিজ্ঞান নিয়েই থাকতেন না। সাহিত্যও খুব ভালোবাসতেন তিনি। লিখতেনও প্রায়ই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর লেখা 'অব্যক্ত' নামের বইটিতে তাঁর রচনাশক্তির প্রমাণ পাই আমরা।

১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর গিরিডিতে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

# আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

আজ আমরা সবাই পেনিসিলিন নামে একরকমের ওষুধের নাম জানি। পেনিসিলিনে আছে রোগজীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা। কত যে রোগ এখন পেনিসিলিন দিয়ে সারিয়ে তোলা হচ্ছে তার হিসেব নেই। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন পেনিসিলিনের কথা কেউ জানত না। এই উপকারী ওষুধটি আবিষ্কার করেছিলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং নামে একজন স্কটিশ বিজ্ঞানী। তাঁর এই আবিষ্কারের জন্য সারা পৃথিবী তাঁর কাছে ঋণী। কোনোদিন কেউ তাঁকে ভুলতে পারবে না।

ফ্লেমিং ছিলেন দরিদ্র পিতামাতার সন্তান। স্কটল্যান্ডের লকফিল্ড অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৮১ সালের ৮ আগস্ট তাঁর জন্ম হয়। চাষির ঘরে জন্ম তাঁর। কাজেই আর্থিক অনটনের মধ্যেই ছেলেবেলা কেটেছে। তার উপর মাত্র সাত বছর বয়সে বাবার মৃত্যু হলে ফ্লেমিং খুব বিপদে পড়েন। নিরুপায় হয়ে ফ্লেমিং একটা জাহাজে চাকরি নেন। এসময় এক কাকার মৃত্যু হলে তাঁর কিছু সম্পত্তি পেয়ে যান ফ্লেমিং। তাঁর অর্থকষ্ট ঘোঁচে।

এবার তিনি লন্ডনে এসে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে থাকেন এবং ১৯০২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে লন্ডনের সেন্ট মেরিজ মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন। ১৯০৬ সালে সেখান থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি পান। এসময় তাঁর পরিচয় হয় এডওয়ার্ড রাইট নামে তখনকার এক নামজাদা অধ্যাপকের সঙ্গে। রাইট তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে টাইফয়েডের টিকা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর উপদেশে ফ্লেমিং প্রথমে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবাণু নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং কয়েক বছর পর সেন্ট মেরিজ হাসপাতালে গবেষণা করতে থাকেন। একই সঙ্গে ফ্লেমিং ওই মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনাও করেন।

একদিন তাঁর গবেষণাগারে হঠাৎই একটা ব্যাপার দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। ফ্লেমিং তখন একরকম ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কতকগুলো পাত্রে ওই জীবাণু রাখা ছিল। একদিন তাঁর নজরে আসে যে, তার মধ্যে একটি পাত্রের জীবাণু মারা গেছে। অন্য পাত্রগুলোর জীবাণু যেমন বেঁচে ছিল তেমনই রয়েছে। তাহলে ওই পাত্রের জীবাণুগুলো মরল কেন? তিনি দেখলেন ওই পাত্রের গায়ে ছত্রাক জমেছে। তবে কি ছত্রাকের জন্যেই জীবাণু মরল? যেমনি কথাটা মনে হওয়া অমনি শুরু হয়ে গেল পরীক্ষা। পরীক্ষায় দেখা গেল ওই ছত্রাকের মধ্যে পেনিসিলিন

নামে একরকম পদার্থ রয়েছে যার আছে জীবাণু মেরে ফেলার ক্ষমতা। যতবারই ওই ছত্রাক আর জীবাণুকে একসঙ্গে রাখা যায়, ততবারই জীবাণু মরে যায়। এ থেকেই ফ্লেমিং আবিষ্কার করেন পেনিসিলিন। ইঁদুর খরগোশ প্রভৃতি প্রাণীর শরীরে পেনিসিলিন ঢুকিয়ে তিনি দেখলেন যে তাদের শরীরের ক্ষত সেরে যাচ্ছে। ১৯২৯ সালে তিনি তাঁর এই বিরাট আবিষ্কারের কথা একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করলেন।

তবে পেনিসিলিন তো শুধু আবিষ্কার করলেই হবে না। মানুষের শরীরে তাকে প্রয়োগ করে নানা রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে ছত্রাক জাতীয় জিনিসের ভেতর থেকে পেনিসিলনকে বার করতে হবে, তাকে শোধন করতে হবে। কিছুদিন পর ডা. বরিস চেইন ও ডা. ফ্লোরি নামো দু'জন গবেষক সেই কাজটা করে ফেললেন। এঁরা গবেষণা চালিয়ে কিছুকালের মধ্যেই পেনিসিলিন তৈরি ও শোধন করার উপায় বার করে ফেললেন। এবার লন্ডনের পুলিশ হাসপাতালের রোগীদের উপর পেনিসিলিন ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করা হল। রোগীরা তার ফলে সেরে উঠতেই চারদিকে ফ্লেমিঙের জয়জয়কার উঠল।

কয়েক বছর পরে ১৯৪৫ সালে এই বিরাট আবিষ্কারের জন্য ফ্লেমিংকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১৯৫৫ সালের ১১ মার্চ লন্ডনে ফ্লেমিংয়ের মৃত্যু হয়।

# স্যার আইজাক নিউটন

আজ থেকে সাড়ে তিনশো বছর আগে ইংল্যান্ডের উল্‌স্‌থর্প নামে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহাবিজ্ঞানী আইজাক নিউটন। দিনটা ছিল ১৬৪২ সালের বড়দিন, ২৫ ডিসেম্বর। নিউটনের বাবা এক গরিব কৃষক। আইজাকের জন্মের কিছুদিন আগে তিনি মারা যান। পয়সাকড়িও বিশেষ রেখে যাননি। তাই বাড়ির সবার ইচ্ছে ছিল অল্পস্বল্প লেখাপড়া করুক তাঁদের ছেলে, আর একটু বড় হলেই চাষের কাজ

দেখুক। কিন্তু ছেলের তেমন ইচ্ছে নয়। প্রথমে নিউটন গ্রামের স্কুলেই ভরতি হলেন। কিছুদিন সেখানে লেখাপড়া করে চলে গেলেন কাছাকাছি একটা গ্রামের স্কুল। তখনকার স্কুলে অন্য সব বিষয়ের মধ্যে লাতিন ভাষার উপর জোর দেওয়া হতো বেশি। ওখানকার পড়া শেষ হলে উনিশ বছর বয়সে নিউটন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। ভরতি হন কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে।

কিশোর বয়সে লেখাপড়ায় বিরাট প্রতিভার কোনো পরিচয় নিউটন দেননি। বরং ছোটখানো যন্ত্রপাতি নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতেই তিনি বেশি ভালবাসতেন। ছোটবেলাতেই নানা জিনিস তৈরি করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। এই সবের মধ্যে ছিল একটা সূর্যঘড়ি, একটা জলঘড়ি আর একটা হাওয়াকল। এ ছাড়া আকাশ দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন তিনি। অনেক কিছুই তাঁকে অবাক করত। অনেক কিছুরই উত্তর খুঁজে পেতেন না। পাবার চেষ্টা করতেন।

ট্রিনিটি কলেজে পড়তে পড়তে বিজ্ঞান আর অঙ্কশাস্ত্র তাঁর খুব ভালো লেগে যায়। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল আগে থেকেই ছিল। এবার সঠিক পথে সেই বিষয়ের চর্চা শুরু হল। সেই সঙ্গে গণিতশাস্ত্রও ভালোভাবে শিখতে লাগলেন। গ্রহ নক্ষত্র সম্বন্ধে, তাদের গতি সম্বন্ধে, তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতে লাগলেন নিউটন। আর এই সময় আগেকার বড় বড় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের কথা আর তাঁদের রচনাও পড়তে লাগলেন তিনি।

১৬৬৫ সালে নিউটন গ্রাজুয়েট হন—তার মানে বি.এ পাশ করেন। ওই বছরই প্লেগ মহামারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে নিউটন গ্রামের বাড়িতে চলে যান। দুবছর

সেখানে থেকেই নিজের খেয়ালে পড়াশুনা করতে থাকেন। শুধু পড়াশুনাই নয়, এই সময় তিনি প্রায়ই গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন। নিউটন নিজেই পরে বলেছেন যে, এ দু বছরেই তাঁর ক্ষমতা সবচাইতে বেশি প্রকাশ পেয়েছিল।

এই সময়ই একদিন তিনি যখন বাগানে বসে নানা কথা ভাবছেন, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন একটা আপেল টুপ করে গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ল। অমন তো কতই পড়ে, রোজই পড়ে। কিন্তু সেদিন নিউটনের মাথায় ঢুকল এক চিন্তা। কেন আপেলটা নিচে পড়ল? কেন সব জিনিস অমন করে নিচেই পড়ে সবসময়? ভাবতে ভাবতে বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র নিউটনের মনে হল নিশ্চয় এমন কোনো শক্তি কোথাও আছে যা সব বস্তুকে নিচের দিকে টানে। এ থেকেই তিনি আবিষ্কার করলেন অভিকর্ষ নামের নিয়ম বা সূত্র। নিউটনই প্রথম জানালেন, সমস্ত বস্তুই একে অপরকে সবসময়ই আকর্ষণ করছে।

তিনি আরও বললেন যে, পৃথিবীর একটা নিজস্ব স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাছাড়া সব বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে টানছে। নিউটন আরও একটা নিয়ম আবিষ্কার করলেন যার নাম মহাকর্ষ। সবাই এটা জানত যে, সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, আবার উপগ্রহ ঘোরে গ্রহের চারদিকে। কিন্তু কেউ জানত না কেন ঘোরে গ্রহ-উপগ্রহগুলো। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র বলল যে, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহগুলোর মধ্যে একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। সেই শক্তির জন্যেই এরা এ ওর চারদিকে ঘোরে, ছিটকে দূরে চলে যায় না ওই অদৃশ্য শক্তির জন্যেই।

ক্রমে ক্রমে নিউটনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেমব্রিজে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক তিনি আগেই হয়েছিলেন।

পরে রয়াল সোসাইটির সদস্য করা হয় তাঁকে। এ এক মস্তবড় সম্মান। ১৭০৫ সালে ইংল্যান্ডের রানি অ্যান তাঁকে 'নাইট' উপাধি দেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল স্যার আইজাক নিউটন।

নিউটনের অভিকর্ষ আর মহাকর্ষ আবিষ্কার একটা বিরাট ঘটনা। এই আবিষ্কার বিজ নকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। সেজন্য অনেকে তাঁকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের জনক বলেন। তবে নিউটন ওখানেই থেমে থাকেননি। তারপরে তিনি আলোকবিদ্যা ও বলবিদ্যা নিয়ে অনেক গবেষণা করেন, অনেক নতুন তথ্য জানতে পারেন। তাঁর সারা জীবনের আবিষ্কার আর গবেষণার কথা তিনি লিখে গেছেন 'প্রিন্সিপিয়া' নামে একখানা বইয়ে। বিজ্ঞানীরা এই বইটিকে খুব শ্রদ্ধা করেন। আলোবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি যা-কিছু জানতে পেরেছিলেন তা লেখা আছে 'অপটিকস' নামে তাঁর আর একখানি বইয়ে।

এই মহাবিজ্ঞানী মারা যান পঁচাশি বছর বয়সে ১৭২৭ সালের ২০ মার্চ লন্ডন শহরে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন তিনি।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

# মাইকেল ফ্যারাডে

গরিবের ছেলেও যে বুদ্ধি আর পরিশ্রমের জোরে মস্তবড় হতে পারে তার অনেক প্রমাণ আছে পৃথিবীর ইতিহাসে। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডেও প্রথম জীবনে ছিলেন খুবই গরিব। লন্ডনের কাছে এক গ্রামের কামার ছিলেন ফ্যারাডের বাবা। আর্থিক সচ্ছলতা একেবারেই ছিল না তাঁর। কাজেই তিনি চেয়েছিলেন ছোটবেলাতেই মাইকেল তাঁর সঙ্গে কামারের কাজ শিখুক। কিন্তু ছেলের সেদিকে মোটেই মন ছিল না। প্রথম দিকে একসময় মাইকেল ফ্যারাডে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেও বেড়িয়েছেন। সেই ছেলেই পরে হলেন

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী!

১৭৯১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের কাছে নেউইংটন নামে এক গ্রামে জন্ম হয় ফ্যারাডের। কিছুদিন গ্রামের স্কুলে পড়ার পর স্কুলের কড়া শাসন তাঁর অসহ্য মনে হল। তিনি স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যখন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স তাঁর, তখন লন্ডনের একটা বইয়ের দোকানে কাজ পেয়ে গেলেন। সেই দোকানে বই বাঁধাইয়ের কাজও হতো। ফ্যারাডে সেই কাজও শিখে নিলেন। দোকানে বাঁধাইয়ের জন্যে যত বই আসত সবই ফ্যারাডে দেখতেন। অনেকগুলো বই তিনিও পড়ে ফেলতেন।

এভাবে পড়তে পড়তে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর একটা গভীর ভালোবাসা জন্মাল। তারপর থেকে তিনি সমস্ত বিজ্ঞানের বই পড়ে ফেলতে লাগলেন। একবার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা নামে একখানা মস্ত বই দোকানে এলো। সেই বইয়ের আবার অনেকগুলো খণ্ড। এটি একটি বিশ্বকোষ। ফ্যারাডে সেই বইখানা উলটেপালটে দেখছিলেন একদিন। দেখতে দেখতে ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ নামে একটা বিষয়ের কাছে এসে তাঁর চোখ আটকে গেল। খুব উৎসাহ ও কৌতূহল নিয়ে তিনি ওই লেখার পুরোটাই পড়ে ফেললেন।

ক্রমে ক্রমে ফ্যারাডে নিজেই বিজ্ঞানের অনেক কিছু জেনে ফেললেন। কিন্তু তিনি তবু খুশি হতে পারছেন না। তাঁর কেবলই মনে হয়, তিনি কোন উপায়ে কীভাবে বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞান অর্জন করবেন। এই সময় ওই দোকানে একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। ফ্যারাডের আগ্রহ দেখে তাঁর খুব ভালো লাগল। তিনি তখনকার খুব নামকরা একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য। প্রতিষ্ঠানটির নাম রয়াল ইনস্টিটিউশন। তিনি ফ্যারাডেকে বললেন ওই ইনস্টিটিউশনে প্রায়ই বিখ্যাত

বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রি হেভির বক্তৃতা হয়। ফ্যারাডে চাইলে তিনি তাঁকে ওই বক্তৃতা শোনার টিকিট যোগাড় করে দিতে পারেন।

একথা শুনে ফ্যারাডে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। টিকিট জোগাড় হয়ে গেলে তা নিয়ে একদিন ফ্যারাডে চলে গেলেন ডেভির বক্তৃতা শুনতে। ফ্যারাডে মোটেই আর পাঁচজনের মতো শ্রোতা নন। তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটা নোটবুক। মুগ্ধ হয়ে ডেভির বক্তৃতা শুধু শুনলেনই না, বক্তৃতার মূল কথাগুলো তিনি তাঁর নোটবইয়ে টুকেও নিলেন। তাঁর তখন মনে হতে লাগল, স্যার হামফ্রি ডেভির কাছে শিখতে না পারলে জীবনটাই মিথ্যে হয়ে যাবে।

তিনি স্যার হামফ্রি ডেভিকে একটা চিঠি লিখে বসলেন, সঙ্গে পাঠালেন ডেভির বক্তৃতার সারাংশ যে নোটবইয়ে টুকে রেখেছিলেন সেটি। তিনি ডেভির কাছে বিজ্ঞান শিখতে চান, চিঠিতে এই কাতর আবেদন ছিল। চিঠি পেয়ে আর ওই নোটবই পড়ে স্যার হামফ্রি ডেভি তো খুব খুশি। তিনি ফ্যারাডেকে ডেকে পাঠালেন। কথাবার্তা বলে তিনি বুঝলেন যে ফ্যারাডে সত্যিই বিজ্ঞান ভালোবাসেন। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে বই বাঁধানোর কাজ ছেড়ে প্রায় বিনা মাইনেতে গবেষণার কাজ করতে রাজি কিনা। ফ্যারাডে তাতেও রাজি। অতএব ডেভি ফ্যারাডেকে তাঁর নিজেরই গবেষণাগারে একটা সামান্য কাজ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ফ্যারাডে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠলেন ডেভির গবেষণার সহকারী। এবার তাঁর জীবনে এলো বিরাট পরিবর্তন। তিনি একদিকে স্যার হামফ্রিকে সাহায্য করেন, আর অন্যদিকে নিজে নিজেই গবেষণা করেন। রসায়ন আর তড়িৎ-চৌম্বক নিয়েই ছিল ফ্যারাডের গোড়ার দিকের গবেষণা। তড়িৎ বা

ইলেকট্রিসিটিতে তিনি অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন। ইস্পাতে কীভাবে মরচে ধরা আটকানো যায়, তা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। কাটা ঘায়ে আমরা যে বেনজিন নামে ওষুধ লাগাই, তা হল একরকম যৌগ। এই বেনজিন তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। চুম্বকশক্তিকে তিনিই প্রথম বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করার উপায় বার করেছিলেন।

আজ সারা পৃথিবীর কলকারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা সম্ভব হয়েছে ফ্যারাডের আবিষ্কারের জন্যেই। ইলেকট্রোলাইসিস বা তড়িদ্‌বিশ্লেষণ ব্যাপারটি এখন পদার্থবিদ্যার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই তড়িদ্‌বিশ্লেষণও তাঁরই আবিষ্কার।

এই বিরাট প্রতিভাধর বিজ্ঞানী সারাজীবনে ছোটবড় মিলিয়ে কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সফল করে তুলেছিলেন। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছিলেন। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান জগতে তাঁকে সবাই খুব সম্মান করত। তাছাড়া এক সময় যে রয়াল ইনস্টিটিউশনে ঢোকবার জন্যে তাঁকে টিকিট জোগাড় করতে হয়েছিল, পরবর্তীকালে তিনি তাঁরই একজন প্রধান সদস্য হয়েছিলেন।

১৮৬৭ সালের ২৫ আগস্ট ছিয়াত্তর বছর বয়সে ফ্যারাডের জীবনাবসান হয়।

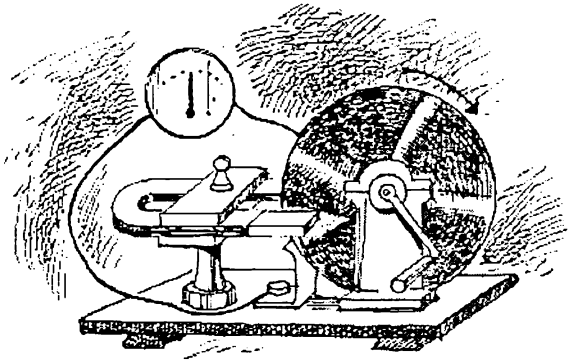

# চার্লস ডারউইন

এবারে তোমাদের এক মস্তবড় প্রকৃতিবিজ্ঞানীর কথা বলব। জাতিতে তিনি ইংরেজ, নাম চার্লস ডারউইন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ইংল্যান্ডের শ্রিউজবেরি অঞ্চলে ১৮০৯ সালের ফেব্রুয়ারি।

ছেলেবেলায় ফড়িং আর প্রজাপতি ছাড়াও নানা রকমের পোকামাকড় ধরে বেড়াতেন ডারউইন। আর জমাতেন নানা রঙের পাথর। ওতেই তাঁর আনন্দ তখন। তবে ছেলেবেলাতেই রসায়নেও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। কয়েক বছর শ্রিউজবেরির স্কুলে পড়ার পর ডারউইন চলে গেলেন এডিনবরায়। আর বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তারি শিখে চিকিৎসক হোক। কিন্তু ডারউইনের তা মোটেই ইচ্ছে নয়।

এবার তিনি গেলেন কেমব্রিজে। এখানে তাঁর পড়ার বিষয় ছিল ধর্ম। তাঁর এ বিষয়টাও তেমন ভালো লাগত না। তিনি প্রাণিবিদ্যা আর উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়া শুরু করলেন। সেই সঙ্গে চলল তাঁর পোকামাকড় সংগ্রহ করার বাতিক।

ঠিক সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল যাতে ডারউইনের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। ১৮৩১ সালে তাঁর বন্ধু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনস্লোস, তাঁকে একটা চকরির সুযোগ করে দিলেন। সেটা হল 'বিগ্‌ল' নামে একটা জাহাজে প্রকৃতিবিদের চাকরি। ওই জাহাজে ডারউইনের কাজ হবে গবেষণার জন্যে নানা জাতির পোকামাকড় আর উদ্ভিদ সংগ্রহ করা। কাজটা ডারউইনের একেবারে মনের মতো। তাই প্রায় বিনা মাইনের হলেও চাকরিটা তিনি নিয়ে নিলেন। দক্ষিণ আমেরিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় পাঁচ বছর ধরে 'বিগ্‌ল' জাহাজে হাজার হাজার পোকামাকড় আর উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করলেন ডারউইন।

এই সমুদ্রযাত্রার সময় তিনি এমন প্রাণীর হাড় সংগ্রহ করেছিলেন যেসব প্রাণী পৃথিবী থেকে আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এক-একটা দ্বীপ থেকে এক-এক রকমের প্রাণীর নমুনা জোগাড় হলে তাদের চেহারার মিল বা অমিল দেখে তাঁর কৌতূহল বেড়ে গেল। এখনকার প্রাণী আর লুপ্ত প্রাণী নিয়েও ভাবনাচিন্তা শুরু হল তাঁর।

এই সমুদ্রযাত্রার সময় পালাপাগাস নামে এক দ্বীপে ডারউইন অনেক সময় কাটিয়েছিলেন। দেশে ফেরার পরে এই ভ্রমণের কথা আর এই ভ্রমণের সময় যা তিনি দেখেছেন, শিখেছেন সেই কথা একটি বইয়ে লিখে ফেললেন।

এই সময় থেকেই তাঁর মনে জীবজগতের ইতিহাস নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছিল। প্রাণীর স্বভাব ও চেহারা কেন বদলে যায় যুগে যুগে, আর কীভাবেই বা বদলে যায়, তাঁর মনে কেবল সেই

চিন্তাই ঘুরপাক খেত। আদিম প্রাণী থেকে আজকের প্রাণীর এই পরিবর্তনকেই বলা হয় প্রাণীর বিবর্তন।

১৮৫৯ সালে যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ বছর, তখন ডারউইন তাঁর আবিষ্কারের কথা 'জীবের উৎপত্তি' নামে একটি বইয়ে লিখে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন যে, জগতের সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ অনেক অনেক বছর ধরে একটা জায়গায় থাকলে, সেই জায়গার উপযোগী কতকগুলো বৈশিষ্ট্য তাদের স্বভাবে আর চেহারায় এসে যায়। আর তাদের বংশধরদের মধ্যেও ওইসব বৈশিষ্ট্য এসে যায়।

তিনি আরও বললেন যে, জীবজগতে সবসময়ই একটা বেঁচে থাকার লড়াই চলছে। সেই লড়াইয়ে জেতে তারাই যাদের যোগ্যতা বা ক্ষমতা আছে। আর যারা প্রকৃতির অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না, তারা আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যায়। নতুন অবস্থার সঙ্গে চলতে পারেনি বলেই ডাইনোসররা খুব শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও একসময় লুপ্ত হয়ে গেছে।

ডারউইনের এই আবিষ্কারের নাম বিবর্তনবাদ। তাঁর কথা সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়েছিল তা নয়। বরং অনেকে এর ভুল বার করার চেষ্টাও করেছে। তবে পরে প্রায় সবাই ডারউইনের মতকে স্বীকার করে নেয়। এখন তাঁর এই মতকে বিজ্ঞানীরা কিছুটা পালটে নিয়েছেন বটে, তবে তাতে তাঁর মত মিথ্যে হয়ে যায়নি।

১৮৮২ সালে চুয়াত্তর বছর বয়সে এই বিশ্ববিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়। অতবড় পণ্ডিত আর বিজ্ঞানী হলেও তিনি খুবই সাধাসিধে স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সহজেই সকলকে আপন করে নিতে পারতেন।

# আলফ্রেড নোবেল

আবিষ্কারের গল্প পড়তে পড়তে এমন অনেক বিজ্ঞানীরা কথা তোমরা জেনেছ যাঁরা তাঁদের কীর্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার জিনিসটা কী তা কি তোমরা জানো? নোবেল সুইডেনের একজন আবিষ্কারকের নাম। তাঁর পুরো নাম আলফ্রেড বারনার্ড নোবেল। তিনি ডিনামাইট নামে একরকম বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছিলেন। আর তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় করা প্রচুর টাকা দিয়ে তিনি চালু করেছিলেন কতগুলো পুরস্কার। প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য—এইসব বিষয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেওয়া

হয় এই পুরস্কার। তাঁর নাম অনুসারে এই পুরস্কারের নাম নোবেল পুরস্কার। আলফ্রেড নোবেলের কথাই এখন বলব।

১৮৩৩ সালের ২১ অক্টোবর সুইডেনের রাজধানী স্পকহোমে জন্ম হয়েছিল নোবেলের। তাঁর বাবা এমানুয়েল নোবেল ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। একসময় তিনি রাশিয়ায় চলে যান এবং সেখানে টর্পেডো আর মাইন নামে একরকম অস্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। আলফ্রেডের লেখাপড়া রাশিয়াতেই শুরু হয়। বাবার ইচ্ছে ছিল আলফ্রেডকে তিনি নিজের কারখানার কাজে লাগাবেন। কিন্তু কিছুদিন বাবার কারখানায় কাজ করলেও ওই কাজ তাঁর একেবারেই ভালো লাগত না। প্রথম দিকে বাড়িতেই গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করে তিনি রসায়ন আর কারিগরি বিদ্যার অনেক কিছুই শিখে ফেলেছিলেন। এবার ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ঘুরে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। পাঁচ-ছটা ভাষায় কথা বলতে শিখলেন। ইঞ্জিনিয়ারিংও শিখে ফেললেন।

কিছুদিন পর নোবেলদের পুরো পরিবারই সুইডেনে ফিরে এলো। এবার আলফ্রেড বিস্ফোরক তৈরির কাজে মন দেন। এই কাজে তিনি তাঁর বাবাকেও সঙ্গে নিলেন। মাটির নিচে খনিতে, পাহাড়ি রাস্তার বড় বড় পাথর সরাতে, আর পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরির কাজে বিস্ফোরক খুবই কাজে লাগবে। অথচ এমন কোনো বিস্ফোরক তখনও জানা ছিল না যা দিয়ে এই কাজ ভালোভাবে আর নিরাপদে হতে পারে।

তখনকার দিনে সাধারণ বারুদকে এই কাজে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু তাতে তেমন ভালো কাজ হতো না। পানির নিচে তা ব্যবহার করাও যেত না। অন্য যেসব বিস্ফোরক ছিল তা মোটেই নিরাপদ নয়। দিনরাত চলল নোবেলের গবেষণা।

নাইট্রোগ্লিসারিন নামে একরকম বিস্ফোরক আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু এটা মোটেই নিরাপদ নয়। নোবেলের উদ্দেশ্য একে নিরাপদ কাজে ব্যবহার করা। তাঁর কারখানায় নাইট্রোগ্লিসারিন তৈরি করা শুরু হল। আর তা নিয়ে নোবেলের গবেষণাও চলল। এই কারখানায় তাঁর ভাইয়েরা আর বাবাও কাজ করতেন। একদিন একটা ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটল ওই কারখানায়। একটা বিস্ফোরণে নোবেলের ছোট ভাই এবং আরও চারজন কর্মচারী মারা গেল। কারখানাটা বিস্ফোরণে প্রায় উড়েই গেল। নোবেল নতুন করে কারখানা তৈরি করতে চাইলে সুইডিশ সরকার আপত্তি করল। তাঁকে 'পাগলা বিজ্ঞানী' বলে লোকে ঠাট্টাও করতে শুরু করল। এক বছর পরে শারীরিক অসুস্থতায় নোবেলের বাবা একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলেন।

এই অবস্থায় অন্য যে কেউ হয়তো হাল ছেড়ে দিত। কিন্তু আলফ্রেড নোবেল ভেঙে পড়লেন না। তিনি নরওয়ে আর জার্মানিতে গবেষণা চালাতে লাগলেন। দু-একবার সেখানেও যে দুর্ঘটনা হয়নি এমন নয়। তারপর আবার সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এসে একটা মস্তবড় জলাশয়ের মাঝখানে নৌকোয় চেপে গবেষণা করতে থাকেন। তিনি সবাইকে বোঝাতে থাকেন যে, তিনি যদি কোনো নিরাপদ বিস্ফোরক আবিষ্কার করতে পারেন তবে তাতে সারা পৃথিবীর মানুষেরই লাভ হবে। যাই হোক, এবার সুইডেনের সরকার তাঁকে অনুমতি দিলেন।

গবেষণা করতে করতে ১৮৬৬ সালে নোবেল লক্ষ্য করলেন যে নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে কাইজেলগার নামে এক রকম মাটি যদি মিশে থাকে তবে অসতর্কভাবে একটুতেই বিস্ফোরণ হবে না। কেবল দরকার মতো বিস্ফোরণ ঘটানো যাবে। আরও

গবেষণা চালিয়ে নোবেল ১৮৬৭ সালে তৈরি করে ফেললেন এক অত্যন্ত শক্তিশালী অথচ নিরাপদ বিস্ফোরক। তিনি তার নাম দিলেন ডিনামাইট।

তাঁর এই আবিষ্কারে চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। এবার পাহাড় ফাটিয়ে পথ তৈরি করা, সমুদ্রের নিচে বিস্ফোরণ ঘটানো, মস্তবড় এলাকা মুহূর্তে পরিষ্কার করা, সবই সম্ভব হল। আর এতে কোনো ক্ষতির ভয়ও থাকল না। এর পরে আরও নানা রকমের সব বিস্ফোরক তৈরি করেছিলেন আলফ্রেড নোবেল। প্রচুর টাকাপয়সাও রোজগার করেন তিনি। একসময় তাঁর মনে হল, তিনি তো মানুষের উপকার করতেই চেয়েছিলেন। সে কাজ তো হয়েছে। এবার তাঁর জমানো টাকাটাও মানুষের কল্যাণে কীভাবে ব্যয় করা যায় তাই ভাবতে লাগলেন।

১৮৯৫ সালে তিনি একটা উইল করলেন। তাতে বলা হল যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সমস্ত জমানো টাকা দিয়ে কতগুলো পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হবে। প্রত্যেক বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য, চিকিৎসাশাস্ত্র এসব বিষয়ে এক একজনকে তাঁদের বিরাট কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কার দেয়া হবে। একেই বলে নোবেল পুরস্কার। এই পুরস্কারের সম্মান আর টাকা দুই-ই সারা পৃথিবীতে তুলনাহীন।

এই দরদি বিজ্ঞানী ১৮৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর মারা যান। কিন্তু তাঁর কীর্তির জন্য' মানুষের কল্যাণের জন্য আর তাঁর ভাবনাচিন্তার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

# আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল

যেসব যন্ত্রের আবিষ্কার দূরকে নিকট করেছে, তার মধ্যে একটা হল টেলিফোন। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা অনেক দূরের একজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারি। এ এক বিরাট আবিষ্কার। এই বিরাট আবিষ্কার কে করেছিলেন জানো? টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল নামে একজন স্কটিশ উদ্ভাবক।

বেল জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় ১৮৪৭ সালের ৩ মার্চ। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি প্রথমে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। পরে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান।

তারপর বেল চলে যান কানাডায়। আর কানাডা থেকে আমেরিকায়। ১৮৭০ সালে আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের পদ পেলেন বেল। এই সময় বেল মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা স্কুল খোলেন। শুধু স্কুল খোলাই তো নয়, তিনি মূক ও বধিরদের যাতে সুবিধে হয় এমন একটা যন্ত্র তৈরি করার জন্যে সারাদিন ভাবতেন, আর অবসর সময়ে নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা চালাতেন।

কয়েক বছর চেষ্টা করেও বেল মূখ বধিরদের জন্যে তেমন কাজের কোনো যন্ত্র তৈরি করতে পারলেন না বটে, কিন্তু ১৮৭৫ সালের জুন মাসে হঠাৎ একদিন তারের ভিতর দিয়ে কথা বলার যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন।

বেলের এক বধির ছাত্রীর বাবা বেলকে একটা গবেষণাগার বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেই গবেষণাগারই হয়ে দাঁড়াল তাঁর ঘরবাড়ি। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে গবেষণা করছিলেন টমাস ওয়াটসন নামে এক ধনী গবেষক। দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বন্ধুত্ব। প্রথম দিকে তাঁরা টেলিগ্রাফ যন্ত্রকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আর তাই করতে করতেই হঠাৎ এসে গেল টেলিফোন।

একদিন এক ঘর থেকে আর এক ঘর পর্যন্ত টাঙানো তামার তারে খুব মৃদু কম্পন শুনতে পেলেন বেল। কীসের যেন আওয়াজ হচ্ছে। আওয়াজটা এতই অস্পষ্ট যে ভালো করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সেই তামার তারের এক প্রান্তে ছিল টেলিগ্রাফের গ্রাহকযন্ত্র। কম্পন থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেল একটা করে শব্দ করেন, আর বন্ধুকে বলেন সেই শব্দটা তারের অন্য প্রান্তে শোনা যাচ্ছে কি না তা দেখতে। নানাভাবে এই পরীক্ষা চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বন্ধু টমাস ওয়াটসন আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন। অন্য ঘর থেকে তিনি শব্দ হুবহু ধরতে পেরেছেন। এবার বেলও কান পেতে সেই শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনতে

পেলেন। তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। বেশ খানিকক্ষণ দুই বন্ধু তারের ভিতর দিয়ে কথা বললেন। পৃথিবীর প্রথম টেলিফোন তৈরি হয়ে গেল।

তাঁর এই যন্ত্রের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গোড়ার দিকে লোকে এই যন্ত্রের গুণ তেমন বুঝতে না পেরে বেলের টেলিফোনকে 'খেলনা' বলে ঠাট্টা করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সারা জগতের মানুষ এর মূল্য বুঝতে পারল। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় একটি প্রদর্শনী হয়েছিল এই সময়। সেই প্রদর্শনীতে অন্য নানা যন্ত্রপাতির সঙ্গে বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোনও ছিল। কিন্তু সেদিকে লোকের নজর গোড়ার দিকে পড়েনি। শেষে একদিন বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বেলের যন্ত্রের প্রশংসা করেন। তারপর থেকেই এই যন্ত্র জনপ্রিয় হতে থাকে।

১৮৭৭ সালের আগস্ট মাসে একদিন বেলের টেলিফোন যন্ত্রটি ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় বসানো হল। সেখান থেকে সরাসরি কথা বলা হল একটি খবরের কাগজের অফিসের সঙ্গে। এভাবেই বেল ইংল্যান্ডের মানুষকে দেখালেন কত কাজ হয় টেলিফোন দিয়ে। ওই বছরই নভেম্বর মাসে জার্মানির বার্লিন শহরে প্রথম পাকাপাকিভাবে টেলিফোন লাইন লাগানো হয়। ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে টেলিফোনের লাইন তৈরি হতে লাগল। দূর হল নিকট।

আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতি অবশ্য করেছিলেন বেলেরই বয়সী আর এক বিজ্ঞানী। তাঁর নাম টমাস আলভা এডিসন। তবে টেলিফোনের উদ্ভাবক হিসেবে গ্রেহাম বেলের নামই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট পঁচাত্তর বছর বয়সে বেলের মৃত্যু হয়।

# মাদাম কুরি

নোবেল পুরস্কার এক মস্তবড় সম্মান। এই পুরস্কার দেয়া হয় খুব বড় কোনো কৃতিত্বের জন্যে। খুব কম লোকের ভাগ্যেই এমন সম্মান জোটে। আর দু-দুবার নোবেল পুরস্কার পাওয়া তো প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। আজ পর্যন্ত কেবল একজনই এই পুরস্কার দুবার পেয়েছেন। তিনি হলেন মাদাম কুরি। মাদাম কুরি প্রথমে নোবেল পুরস্কার পান পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্বের জন্যে। আর দ্বিতীয়বার পান রসায়নে বিরাট কৃতিত্বের জন্যে। বুঝতেই পারছো কত বড় বিজ্ঞানী ছিলেন তিনি।

মাদাম কুরির নাম ছিল মারিয়া ক্লদভস্কা। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ শহরে। বাবা ওয়ারশতে শিক্ষকতা করতেন। মারিয়া এবং তাঁর বোন ব্রোনিয়ার ছেলেবেলা কাটত বইপত্রের মধ্যে। তাঁদের টাকাপয়সা খুব বেশি ছিল না। অল্প বয়সে একটা খুব সাধারণ চাকরি করে মারিয়া নিজের আর বোনের পড়াশুনার খরচ চালাতেন। তারপরে তিনি ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়তে গেলেন। বিজ্ঞানে তাঁর দারুণ মেধার কথা পরিবারের সবাই জানত। স্কুলে বিজ্ঞানে কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার দিনে মেয়েদের ভরতি করা হতো না। মারিয়া তখন চলে গেলেন ফ্রান্সে। ভরতি হলেন সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ১৮৯৩ সালে পদার্থবিদ্যায় খুব ভালো ফল করলেন তিনি। পরীক্ষায় একেবারে প্রথম হলেন। কিন্তু শুধু পরীক্ষায় প্রথম হলেই চলবে না। মারিয়া তখন উৎসুক হয়ে উঠেছেন গবেষণা করার জন্যে। মনপ্রাণ দিয়ে বিজ্ঞানকে ভালোবাসেন তিনি। গণিত ও পদার্থবিদ্যার বিখ্যাত সব অধ্যাপকরা তখন তাঁর শিক্ষক।

এ সময় এক তরুণ বিজ্ঞানী ও গবেষকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। এই তরুণ গবেষকের নাম পিয়ের কুরি। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে গবেষণা শুরু করলেন। পরে পিয়ের কুরিকেই বিয়ে করলেন মারিয়া। তখন থেকেই তাঁর নাম হল মেরি কুরি বা মাদাম কুরি।

প্রথম দিকে মাদাম কুরি চুম্বক ও তড়িৎ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। সেই সময় তাঁর নজর গেল আরেক দিকে। বেকারেল নামে এক বিজ্ঞানী পিচব্লেন্ড নামে একরকম খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছিলেন ইউরেনিয়াম

নামে ধাতুর মতো একটা পদার্থ। এই পদার্থটির রশ্মি বিকিরণ করার শক্তি আছে। পিয়ের কুরি ও মাদাম কুরির মনে হল যে পিচব্লেন্ডের মধ্যে আরও এমন কেনো পদার্থ পাওয়া যেতে পারে যার বিকিরণের শক্তি আরও অনেক বেশি। যেই মনে হওয়া অমনি আরম্ভ হয়ে গেল কাজ। দুজনে গবেষণায় মেতে উঠলেন। তাঁদের এখন উদ্দেশ্য পিচব্লেন্ডের মধ্যে যতরকম উপাদান আছে সেগুলোকে আলাদা করা। কিন্তু তার জন্যে তো অনেক অনেক পিচব্লেন্ড চাই। প্রথমে যা পাওয়া গেল তাই দিয়েই তাঁরা কাজ চালাতে লাগলেন। পরে জানা গেল যে অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়া প্রদেশে পিচব্লেন্ডের খনিতে প্রচুর পিচব্লেন্ড আছে। পিয়ের কুরি আর মাদাম কুরি অস্ট্রিয়ার সরকারের কাছে আবেদন করলেন। অস্ট্রিয়ার সরকার তাঁদের গবেষণায় সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে গেল অনেক পিচব্লেন্ডের বস্তা। এবার গবেষণায় আর বাধা নেই।

১৮৯৮ সালে কুরি দম্পতি আবিষ্কার করলেন একটি ধাতু যার বিকিরণ ক্ষমতা ইউরেনিয়ামের চাইতে বহুগুণ বেশি। তাঁরা এর নাম দিলেন পোলোনিয়াম। মাদাম কুরির দেশ পোল্যান্ড। পোল্যান্ডের নামানুসারেই এই ধাতুটির ওই নাম রাখা হয়েছিল। এই ধাতুর রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতার নাম দেয়া হল রেডিয়ো-অ্যাকটিভিটি। আমরা বাংলায় বলি তেজস্ক্রিয়তা।

১৯০৩ সালে কুরি দম্পতি এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য একসঙ্গে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেলেন।

কিন্তু এখানেই তাঁদের কৃতিত্ব বা গবেষণা শেষ হয়ে যায়নি। দুজনে দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। কিন্তু দিনরাত তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার ফলে তাঁদের শরীরে নানারকম অসুস্থতা দেখা দিল। শরীর ক্রমেই দুর্বল

হতে লাগল। ১৯০৬ সালে একদিন পিয়ের কুরি গাড়িচাপা পড়ে মারা গেলেন। জীবনে যাঁকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসতেন আর শ্রদ্ধা করতেন, তিনি চলে যাওয়ায় মাদাম কুরি দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়লেন। তবু তাঁর গবেষণা থেমে যায়নি। তাঁর তখনও ধারণা যে, পিচব্লেন্ড থেকে আরও একটি শক্তিশালী তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করতে পারবেন তিনি।

সত্যি সত্যিই তাই হল। ১৯১০ সালে মাদাম কুরি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম নামে একটি পদার্থ। তারপর চলল রেডিয়াম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রেডিয়ামের আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের জগতে একটা বিরাজ তোলপাড় হয়ে গেল। রেডিয়ামকে নানা কাজে লাগানো সম্ভব হল। তাঁর এবারের এই কৃতিত্বের জন্যে মাদাম কুরি ১৯১১ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন। কিন্তু রেডিয়ামের রশ্মি তাঁর শরীরকে খুবই অসুস্থ আর দুর্বল করে ফেলল। আরও অনেকদিন গবেষণা করার পর ১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই মাদাম কুরির মৃত্যু হয়।

মাদাম কুরির মেয়ে ইরিন কুরি এবং জামাতা জোলিয়ো কুরিও ১৯৩৫ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। মাদাম কুরির পরিবারের একটা বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, পৃথিবীতে আর কোনো পরিবারের কেউ মোট পাঁচবার নোবেল পুরস্কার পাননি। তবে মাদাম কুরির দুর্ভাগ্য যে, মেয়ে-জামাইয়ের নোবেল পুরস্কার পাওয়া তিনি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর নিজের আবিষ্কারের জন্যে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর আবিষ্কৃত রেডিয়াম ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগছে। পরমাণুর গবেষণায়ও রেডিয়াম কাজে লাগছে। তবে একে পরমাণু বোমা তৈরির কাজে লাগিয়ে মানুষ রেডিয়ামের অপব্যবহার করছে।

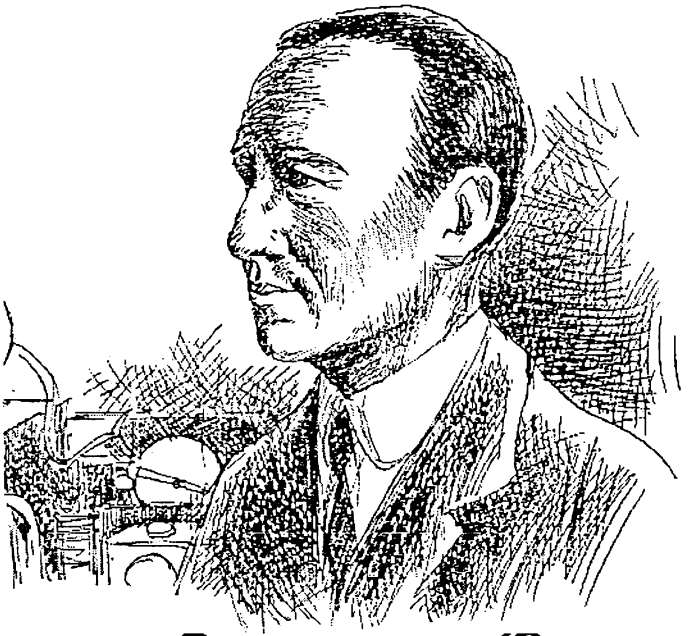

# গুলিয়েলমো মার্কনি

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে যখন টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হল তখন মানুষের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কীভাবে তারের ভিতর দিয়ে খবর দূরে চলে যায়, সে এক ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি আশ্চর্যের ব্যাপার বিনা তারে খবর বহুদূরে পাঠানো। একেই বলে বেতার। এই বেতারের আবিষ্কারক গুলিয়েলমো মার্কনি নামে এক ইতালীয় বিজ্ঞানী। তাঁর ওই বিরাট আবিষ্কারের কথাই এখন বলব।

১৮৭৪ সালের ২৫ এপ্রিল ইতালির বলোনিয়া শহরে জন্ম হয়েছিল মার্কনির। ইতালির লেগ্‌হর্ন অঞ্চলের এক পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করেন তিনি। তারপর নিজের শহর বলোনিয়ায় ফিরে এসে গবেষণা করতে শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স কুড়িও হয়নি।

বাবা মোটেই খুশি হতে পারেননি ছেলের এই অদ্ভুত খেয়াল দেখে। তবুও মার্কনি মনপ্রাণ দিয়ে গবেষণা করে যেতে লাগলেন। যখন তিনি স্কুলের ছাত্র, তখন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হাইনরিখ হার্টস বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। হার্টস পরীক্ষা করে জানতে পেরেছিলেন যে, মহাকাশে ক্রমাগত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, আর সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে সারা পৃথিবীতে। হার্টসের গবেষণা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। কারণ মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এবার মার্কনি হার্টসের ওই তথ্য নিয়ে নতুন করে গবেষণায় মেতে উঠলেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ব্যবহার করে দূরে খবর কীভাবে পাঠানো যায়—এটাই এখন তাঁর গবেষণার বিষয়। ঠিক এই সময় ১৮৯৪ সালে তাঁর যখন মাত্র কুড়ি বছর বয়স তখন একদিন একটা ঘটনা ঘটল। মার্কনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর গবেষণাগারে একটি টেলিগ্রাফের চাবিতে চাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বারো ফুট দূরে একটা ঘণ্টা বেজে উঠছে। মার্কনি বুঝতে পারলেন যে, এই ঘণ্টা বাজছে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে। টেলিগ্রাফের চাবি আর ঘণ্টা এই দুটো মোটেই কোনো তার দিয়ে জোড়া ছিল না। এই ঘটনাটা দেখি মার্কনি এতই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর মাকে ডেকে এনে দেখালেন। ছেলের এই সাফল্য দেখে মাও খুব উৎসাহিত হলেন। তিনি মার্কনিকে ইংল্যান্ডে গিয়ে আরও গবেষণা করতে বললেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ইংল্যান্ডে গেলে মার্কনির গবেষণায় আরও উন্নতি হবে।

এর কিছুদিন পরে মার্কনি আর তাঁর ভাই আর একটা পরীক্ষা করলেন। তাঁর বাড়ির পাশে একটা ছোট পাহাড়ের নিচ থেকে মার্কনি বেতার সংকেত পাঠালেন, আর তাঁর ভাই পাহাড় থেকে সেই সংকেত ধরামাত্র হাত নেড়ে সেকথা মার্কনিকে জানালেন। এর ফলে মার্কনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন।

এরপর মার্কনি তাঁর গবেষণার সুবিধে হবে ভেবে ইংল্যান্ডে গেলেন। ১৮৯৭ সালে প্রায় বারো মাইল দূরের একটা জায়গায় বিনা তারে বেতার সংকেত পাঠিয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি চাইলেন ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে খবর পাঠাতে। কিন্তু যেদিন সবার সামনে এটা করে দেখানোর কথা তার আগের দিন প্রচণ্ড ঝড়ে তাঁর সব আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল। মার্কনি দমলেন না। প্রচুর পরিশ্রম করে আবার সব ঠিকঠাক করলেন। এবার তিনি ইংলিশ চ্যানেলের এক পার থেকে অন্য পারে সংকেত পাঠালেন। বহু লোক এই ঘটনার দিন হাজির ছিল।

মার্কনির এই সাফল্য দেখে সবাই সেদিন আনন্দে অধীর। ১৯০১ সালে মার্কনি আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে বেতারে খবর পাঠিয়ে সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দেন। এভাবেই তৈরি হল রেডিও বা বেতারযন্ত্র। মহাকাশে সব সময় যে বেতার তরঙ্গ তৈরি হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে সেই অদৃশ্য তরঙ্গের মাধ্যমে খবর বা সংকেত দূরে বহুদূরে পাঠানোর কৌশল আবিষ্কারই মার্কনির আসল কৃতিত্ব। পরে এই আবিষ্কারকে আরও নানা কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯০৯ সালে মার্কনির এই মস্তবড় কৃতিত্বকে স্বীকৃতি জানানো হল তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ দিয়ে। তখন তার বয়স মাত্র ৩৩ বছর।

এখানে একটা কথা অবশ্য বলতেই হবে। আমাদের বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও প্রায় একই সময় বেতার সংকেত পাঠাবার ব্যাপারটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল সেটা জানতে পারে আরও পরে। তার আগেই মার্কনির আবিষ্কার স্বীকৃতি পেয়ে যায়।

১৯৩০ সালে মার্কনি ইতালির রয়াল অ্যাকাডেমির সভাপতি হন। তবে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

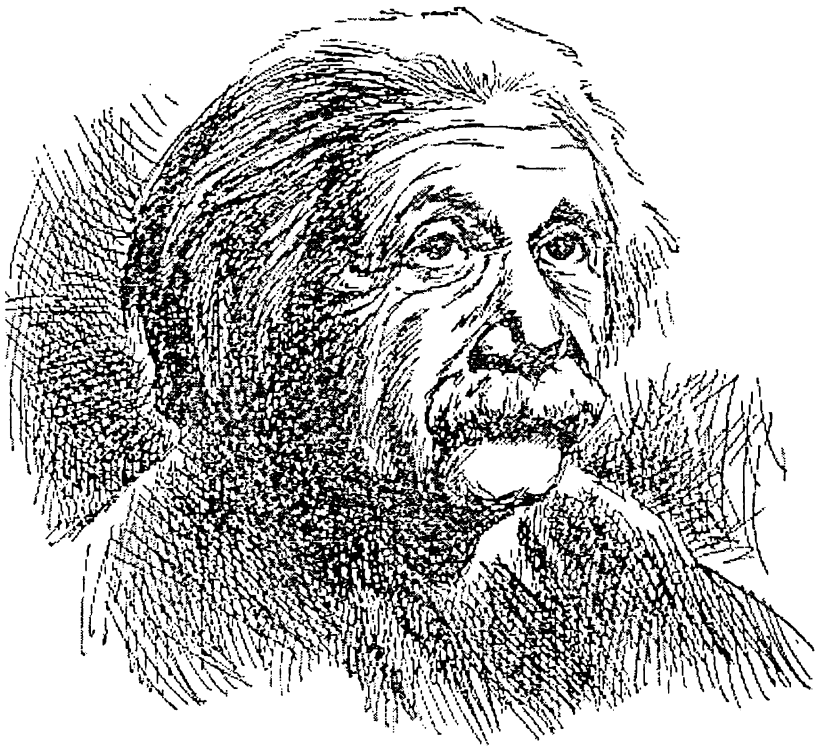

# আলবার্ট আইনস্টাইন

বিজ্ঞানীরা পণ্ডিত মানুষ। সাধারণ লোকে তাঁদের দূর থেকে শ্রদ্ধা করে কিন্তু তাঁদের নিয়ে তেমন মাতামাতি করে না। কিন্তু একজন বিজ্ঞানীকে সাধারণ মানুষ শুধু চিনতই না, তাঁকে ভীষণ ভালোবাসত। এই জনপ্রিয় বিজ্ঞানীর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। আইনস্টাইনের আবিষ্কারের ফলে মহাবিশ্ব সম্পর্কে মানুষের ধারণাই বদলে গিয়েছিল।

জার্মানির উল্‌ম্‌ শহরের এক ইহুদি পরিবারে আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম হয় ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ। তাঁর বাবা হেরমান আইনস্টাইন ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। আলবার্টের

ছেলেবেলার দিনগুলো অবশ্য বেশিরভাগই কেটেছে মিউনিখ শহরে। বাবা ব্যবসার জন্যে থাকতেন ইতালিতে। তাই আলবার্ট থাকতেন মায়ের কাছে। মায়ের ছিল সংগীতে অনুরাগ। তা থেকেই আলবার্টও সংগীতকে ভালোবাসতে শিখিছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়স থেকেই বেহালা বাজানো শিখেছিলেন। সেই বেহালা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী।

কিন্তু পরে যিনি বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন, অল্প বয়সে তিনি লেখাপড়ায় মোটেই তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। স্বভাবেও ছিলেন লাজুক। লোকের সঙ্গে খুব একটা মিশতে পারতেন না। তবে তাঁর মনে ছিল সবকিছু জানার জন্যে অশেষ কৌতূহল। বিদ্যালয়ের পড়ায় বা পরীক্ষায় ভালো ফল করার চেষ্টা তেমন না করলেও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ এতই বেশি ছিল যে সে সম্বন্ধে যেকোনো বই পেলেই তিনি পড়ে ফেলতেন। চৌদ্দো-পনেরো বছর বয়সে তিনি সুইটজারল্যান্ডের এক পলিটেকনিক স্কুলে ভরতি হন। সেখান থেকে মাঝারি রকমের নম্বর পেয়ে এনট্রান্স পাশ করেন। পরে ১৯০০ সালে সেখান থেকেই বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করেন। তখন থেকেই গণিত আর পদার্থবিদ্যা খুব ভালো করে জানার জন্যে তাঁর মনে একটা প্রবল ইচ্ছে জাগল। একটা পেটেন্ট অফিসে খুব সাধারণ একটা চাকরি নিলেন আইনস্টাইন। বিয়েও করলেন এ সময়।

ক্রমে ক্রমে আইনস্টাইনের জীবনটা ঘুরে যেতে লাগল। স্কুলে ছাত্র হিসেবে কোনো দিনই যে বিরাট নম্বর পেয়ে শিক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিতে পারেনি, সেই আইনস্টাইনই এবার তাঁর মেধা আর উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিতে শুরু করলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই আলো সম্পর্কে একটা প্রবন্ধে একেবারে নতুন কথা বললেন। তাতে তিনি এমন সব কথা বললেন যা বিজ্ঞানীদের মোটেই জানা ছিল না। আর একটা প্রবন্ধে তিনি চলন্ত বস্তুর গতি নিয়ে এমন নতুন কথা বললেন, যা বিজ্ঞানীদের খুবই ভাবিয়ে তুলল। তাঁর গবেষণার বিষয় পদার্থবিদ্যা হলেও তাতে গবেষণাগার

লাগত না। কারণ তিনি পৃথিবীকে যে নতুন তত্ত্ব জানালেন তা পুরোপুরি গণিতের সাহায্যে তৈরি করেছিলেন।

এসব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের জন্যে আইনস্টাইনের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লেও যে আবিষ্কারের জন্যে তাঁর খ্যাতি সবচাইতে বেশি তা হল আপেক্ষিকতাবাদ।

আপেক্ষিকতাবাদ বলতে যে কী বোঝায় তা সহজে আর অল্প কথায় বলা যায় না। কেবল এটুকুই বলা যায়—গতি, দূরত্ব, দৈর্ঘ্য সবই অন্য জিনিসের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে হয়। তুলনা না করলে একরকম—তুলনা করলে অন্যরকম। পাশাপাশি দুটো রেলগাড়ি যদি একই গতিতে একই দিকে ছোটে তবে একটা গাড়ির যাত্রীরা মনে করবে যে দুটো গাড়িই থেমে আছে। আবার যে লোকটা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে দেখবে দুটো গাড়ি হু হু করে ছুটে গেল।

বড় হয়ে আইনস্টাইনের আবিষ্কার সম্বন্ধে আরও ভালো করে জানবে। এখন শুধু এটুকু জেনে রাখো যে আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সব ধারণা বদলে দিল। মহাবিশ্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এর পরে নতুন করে ভাবতে লাগলেন। আইনস্টাইনের আবিষ্কারকে এ যুগে পদার্থবিদ্যায় সবচাইতে বড় আবিষ্কার বলে মনে করা হয়।

আইনস্টাইন শুধু যে একজন মস্তবড় বিজ্ঞানী তাই নয়। তিনি একজন মস্ত বড় মানুষ। তাঁকে বলা হয় এযুগের একজন মানবতাবাদী। তিনি মানুষের শান্তি ও মঙ্গলের কথা ভাবতেন। যুদ্ধ কীভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়ে ভাবতেন। অথচ জার্মানির শাসক হিটলার যখন ইহুদিদের দেশছাড়া করতে লাগলেন, আর তাদের উপর নিদারুণ অত্যাচার করতে লাগলেন, তখন এই আইনস্টাইনকেই দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যেতে হয়। ১৯৫০ সালে তাঁর বিরাট আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। অবশ্য তার পরে তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল এই মহান বিজ্ঞানী পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু বিজ্ঞানী আর মানবতাবাদী হিসেবে তিনি যে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পেয়েছেন তার তুলনা নেই।

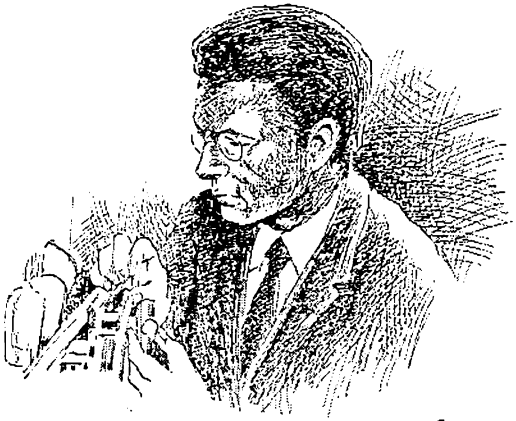

# জন লজি বেয়ার্ড

টেলিভিশন বা দূরদর্শন এখন লোকের ঘরে ঘরে। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় দূরের জিনিসের চলন্ত ছবি ফুটিয়ে তোলা যে কী কঠিন কাজ ছিল, তা কি জানো? বেতারযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পরে বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন যে, কথা বা গান যদি বিনা তারে দূরে পাঠানো যায়, তবে চলন্ত ছবিই বা কেন দূরে পাঠানো যাবে না? টেলিভিশন অবশ্য কোনো একজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার নয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেকের চেষ্টায় শেষে টেলিভিশন আবিষ্কৃত হয়। তবে যাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি তাঁর নাম জন লজি বেয়ার্ড।

এই স্কটিশ বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছিল স্কটল্যান্ডের গ্ল্যাসগোর কাছে হেলেনসবার্গে ১৮৮৮ সালের ১৩ আগস্ট। বাবা ছিলেন একজন যাজক বা খ্রিস্টান পাদরি। গরিব তাঁরা। ছেলেবেলা থেকেই টানাটানির মধ্যে সংসার চলত। চার ভাইবোনের মধ্যে বেয়ার্ডই ছোট। গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করে বেয়ার্ড পড়তে গেলেন গ্ল্যাসগোর রয়াল টেকনিকাল কলেজে। ওখান থেকে পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি একটা ছোটমতো বিদ্যুতের কোম্পানিতে চাকরি নিলেন। কিন্তু দুর্বল শরীরের জন্যে সে চাকরি বেশিদিন করতে পারলেন না। কিছুদিন পরে বেয়ার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা শুরু করলেন। তারপর করলেন একটা জ্যাম-জেলির কারখানা। সেও বেশিদিন চলল না। একের পর এক চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি কিছুদিনের জন্যে ত্রিনিদাদে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কাটিয়ে ১৯২২ সালে লন্ডনে ফিরে এলেন।

এবার তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটা কাজে হাত দিলেন। মেতে উঠলেন টেলিভিশন আবিষ্কারের নেশায়। তাঁর টাকাও ছিল না, টেলিভিশন সম্বন্ধে নানাদিকে যে গবেষণা চলছিল, তার খবরও সবটা তাঁর জানা ছিল না। তবু অদম্য মনের জোরকে সম্বল করে কাজ করে যেতে লাগলেন। টেলিভিশন আবিষ্কারের জন্য যেসব সরঞ্জাম তিনি জোগাড় করেছিলেন তা এতই সামান্য যে শুনলে অবাক হয়ে যাবে। তিনি যোগাড় করলেন একটা চায়ের পেটি, একটা পাতলা কাঠের বাক্সো, একটা বৈদ্যুতিক মোটরযন্ত্র, একটি নিয়ন বাতি, সেলিনিয়াম নামে একরকম ধাতু। এসব যোগাড় হয়ে গেলে বেয়ার্ড তাঁর কাজ শুরু করলেন। নানাভাবে প্রথমে তিনি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। দু'বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে তিনি সফল হলেন। প্রথমে তিন গজ দূরে একটা পর্দার ওপর ছায়া ফেলতে পারলেন। ছায়াটা অবশ্য খুবই অস্পষ্ট। তাছাড়া তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন তারের।

অবশেষে ১৯২৪ সালের শেষদিকে বেয়ার্ড পুরোপুরি সফল হলেন। ১৯২৫ সালের ২ অক্টোবর তিনি প্রচার করলেন যে তিনি টেলিভিশন দেখাবেন। তাঁর ঘরে সেদিন অনেক লোক জড়ো হয়েছিল। অনেক মানীগুণী লোকও এসেছিলেন। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন যে পাশের ঘরে বসে থাকা বেয়ার্ডের ছবি পর্দায় স্পষ্ট ফুটে উঠল। এ যেন ম্যাজিক। কী করে সম্ভব হল এটা? বেয়ার্ড তরঙ্গের সাহায্যে ছবি অন্য ঘরের পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই ঘটনাটি সারা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারপর থেকে অবশ্য টেলিভিশনের অনেক উন্নতি হয়েছে। বেয়ার্ড নিজেও তাঁর গ্রাহক আর প্রেরক যন্ত্রের অনেক উন্নতি করেছিলেন। ১৯২৭ সালে বেয়ার্ড টেলিভিশনের ছবি লন্ডন থেকে সাগর পেরিয়ে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে পাঠিয়েছিলেন। তবে একথা মনে রাখতেই হবে যে, জন লজি বেয়ার্ড যা তৈরি করেছিলেন তা হল টেলিভিশনের প্রথম অবস্থা। আজ আর টেলিভিশন আগের অবস্থায় নেই। এখন তার অনেক উন্নতি হয়েছে।

বেয়ার্ডের মৃত্যু হয় ১৯৪৬ সালের ১৪ জুন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বেয়ার্ড টেলিভিশন নিয়ে তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। তিনি টেলিভিশনের পর্দায় স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাও করে গেছেন শেষ পর্যন্ত।

❑❑❑

গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়।